শারদ সংখ্যা

জেলার খবর সমীক্ষা

অষ্টম বর্ষ

আশ্বিন ১৪২১ অক্টোবর ২০১৪

বিষয় ভাবনা ঃ আজকের শৈশব

কিশোর বেলা
ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ৪

শৈশবের বৈশিষ্ট্যই কি উত্তরকালের পরিচায়ক
ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ ১১

প্রতিভায় প্রতিভাত শৈশব
ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৫

শৈশব আছে শৈশবেই
প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য ১৬

সেই শৈশব এখন শব
পল্টু ভট্টাচার্য ১৮

ছেলে ভুলানো (?) ছড়া
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ২০

লক্ষধরের সমস্যা এবং মধ্যযুগের একটি কাহিনি
শ্যামল বেরা ২২

ফুলটুসির মনের কথা
তাপস বাগ ২৩

শিশুর আচরণ ঃ ধারণা ও প্রকৃত সত্য
মহুয়া দাস ২৪

শিক্ষা এক চলমান প্রক্রিয়া
মৌসুমী চক্রবর্তী ২৮

অসমাপ্ত
উত্তমকুমার পাল ২৯

নিবন্ধের নিবন্ধন ঃ

নজরুল গীতি বিচিত্রা
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৩

ওষুধ বিক্রেতার ডাক্তারি
ডা. শুভেন্দু ভট্টাচার্য ৩৪

গল্পের খোঁজে
ইমন পাল ৪১

রোমন্থন ঃ

পথ সঙ্গী মা কালী
মলয় বসু ২৫

স্বাধীনতা হীনতায়
অমিতকুমার রায় ৩০

ছোটদের পাতা ঃ ৪৫ - ৫২

ভ্রমণ ঃ

দ্বীপান্তরের ডায়েরী
কাবেরী রায় ৩৭

গল্পের দরবার ঃ

দ্রোণাচার্য
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ৩১

পরার্থ
সুজয় বাগচী ৩৫

ত্রসরেণু
জহর চট্টোপাধ্যায় ৪২

ছন্দবাণী ঃ

সময় ও শৈশব
প্রণব কুমার দাস ১০

জ্ঞান ফিরুক
লমা রমা কুৎনস ১০

আমার দাবী
মালতী দাস ২১

জীবন
শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ২১

আব্রাহাম লিঙ্কনের চিঠি ও তার অনুবাদ
প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ২৬

বল্ কেন
অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় ২৬

শাশ্বতী তুমি যে রকম
প্রবীর ব্যানার্জী ৩০

চিঠির নামে
উষ্ণীষ গুহ ৩৬

ও অমৃতের সন্তান
সুস্মিতা রায়চৌধুরী ৩৬

শারদীয়া
বেলা ব্যানার্জী ৪০

তারই জন্য
তপনকুমার ভৌমিক ৪০

একমাত্র দিদি
গুরুদাস পাল ৪০

তারা চুরি
সপ্তাশ্ব ভৌমিক ৪২

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে আট বছর হয়ে গেল। প্রথম প্রকাশের সময় সত্যি ভাবাই যায়নি যে এতবছর ধরে একটানা এমন একটা ছোট পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। মা দুর্গার কৃপায়ই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক পত্রিকা প্রকাশে নানা বাধা এলেও ভাটা পড়েনি। এবারের শারদ সংখ্যায় একটি বিষয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে। শৈশবের সমস্যা বর্তমান সমাজে বহু আলোচিত ও সমালোচিত তথাকথিত এক 'জ্ঞানচর্চা'-র। বিষয়। শৈশব কি সত্যিই বদলে যাচ্ছে না কি নিছকই সমাজের মনগড়া এক ধারণা মাত্র। 'জেনারেশন গ্যাপ' কি সত্যিই এজন্য দায়ী? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজারই চেষ্টা এবারের বিষয় ভাবনায় যার নাম 'আজকের শৈশব'। এ বছর বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গবেষক ও চিকিৎসক ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ (যিনি এযাবৎ মাত্র তিনজন রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত চিকিৎসককুলের অন্যতম) আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে একটি মূল্যবান লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও এই বিষয়টি নিয়ে আরও যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। সঙ্গে অবশ্যই থাকছে ছোটদের পাতা ও অন্যান্য রচনা। পত্রিকা কেমন হয়েছে তার বিচার পাঠকরাই করবেন।

পুজো সকলের ভাল কাটুক এই আশা নিয়ে সব লেখক-লেখিকা, গ্রাহকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা প্রকাশে সংশ্লিষ্ট মুদ্রক ও অন্যান্য শুভানুধায়ীদের সকলকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শারদ সংখ্যার উদ্বোধন
মহালয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪
'বোধোদয়' স্কুলের কুসুম মঞ্চ
প্রকাশ উপলক্ষে আলোচনা সভা
বিষয় ঃ আজকের শৈশব
আলোচক ঃ অধ্যাপক ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
সঞ্চালনা ঃ ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
কম খরচে কম্পিউটার শিক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
রোটারি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ও ভোকেশনাল (টেলারিং) ট্রেনিং
সহযোগিতায় ঃ আই.সি.এ. ও রোটারি ক্লাব অফ সল্টলেক মেট্রোপলিটন
পরিচালনায় ঃ আর.সি.সি. ভাতেঘরী জনকল্যাণ সমিতি
ভাতেঘরী, জয়পুর, হাওড়া - ৭১১৪০১
মানস কুমার মাজী (৯৯৩২০০৭১৬১)

With Best Compliments From
A WELL WISHER
SAROJIT MANNA

কি শো র বে লা

ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

রমাপদবাবু আমার বন্ধু। গলির মোড়েই তাঁর স্কুল কলেজের খাতা-বইয়ের দোকান, পাকা ব্যবসায়ী নন—ব্যাঙ্কের চাকরীতে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে তাঁর এই অবসর কাটানোর দোকান। আড্ডার টানে মাঝে মাঝে আমরা দোকানে জুটি। আজ ক'দিন হোল দোকান বন্ধ দেখে বাড়িতে ঢুঁ মারলাম - কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি? বিমর্ষ রমাপদবাবু আমাকে দেখে খুশি হলেন, তবে পরক্ষণেই তাঁর মনের উৎকণ্ঠা টের পেলাম -- সুগার বেড়েছে দাদা!

— তাতে কি? বাড়ি বসে কেন? ওষুধপত্র খান, সকালে হাঁটুন, দোকানে বসতে বাধা কি? আমি বাতলাই।

— না, মানে রাতে ঠিক ঘুমও হচ্ছে না, বড্ড চিন্তায় আছি জানেন? ক্রমশঃ বিশদ হন রমাবাবু, আসলে ছেলেটার কদিন পরীক্ষা চলছিল, ভালোই ছিল - শেষ হতেই বায়না ধরেছে বন্ধুদের সাথে দীঘা বেড়াতে যাবে, কি মুশকিল বলুন তো?

— এর মধ্যে আবার মুশকিলটা কি? ছেলে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিল, একেবারে ছোট তো নয়, যাক না বেড়াতে?

— না, মানে ঠিক যাওয়া নিয়ে নয়, ওরা বলছে টাটা সুমোয় যাবে, বোঝেনই তো এ বয়সের ছেলে, কখন কি হয়! আমার অবুঝপনায় একটু ক্ষুন্ন হন বুঝি তিনি।

ইতিমধ্যেই এসব নিয়ে বাড়িতে বিতণ্ডা হয়ে গেছে এবং রমাপদবাবুর সুগার বাড়ার ইতিবৃত্তও সম্ভবতঃ এটাই। শেষ পর্যন্ত ওনাকে বোঝাতে ব্যর্থই হলাম সেদিন তবু ভালো উনি তৃণাদের স্কুলের একসকার্সানে ওর মায়ের মতো যেতে চাননি।

আড্ডায় কথাটা উঠতে আড্ডারত্ন সতুদার মন্তব্য—'আরে আমাদের দেশে বাবা-মায়েরা চিরকালই এমন, সাধে রবীন্দ্রনাথকে 'রেখেছো বাঙালি করে' লিখতে হোলো, যাও সাগরপারে, 'টিন এজ' হোল তো চললো গট্‌গট্ করে আলাদা থাকতে, আর আমাদের ছেলেমেয়ে হোস্টেলে থাকলেও বাবা-মা পরীক্ষার সময় পারলে সেখানেই গিয়ে থাকে-এরা তো বুড়ো বয়স অব্দি ছেলেকে 'খোকা' বলে ডাকে, ছেলে বড় হচ্ছে মানলো কই? তা এসব ওদের আপত্তি, অনুশাসন একটা বয়স অব্দি বেশিরভাগই মেনে নেয়, তারপর না মানলেই তো অশান্তির একশেষ — আসলে আমাদের 'শৈশব' হল 'সই সব', মানে সব কিছুই মেনে নিতে হয় তখন, আর 'কৈশোর' মানে যদি একটু আধটু 'কই শোর' না হোলো, মানে প্রতিবাদ-ট্রতিবাদ না হোলো তো কি করে চলে বল্‌তো? আর এই নিয়ে চলছে ঘরে ঘরে ঠান্ডা যুদ্ধ, কখন রাতে ফেরা, কোন বন্ধুর সাথে ফোনে বেশি কথা, কতক্ষণ টিভি দেখা, কোন ড্রেসটা কোথায় পরা— এইসব লেগেই আছে রাতদিন!' সতুদার সহজাত মন্তব্য সবই জলবৎ যেন।

কেউ বলেন বয়ঃসন্ধি, কেউ বা সন্ধিক্ষণ, আবার কারো কাছে শুধুই বাড়াবাড়ির সময় যেন এটা। মানুষের পরিপূর্ণতার কাঠামোয় প্রকৃতির মডেলের ফিনিশিং টাচ্ দেওয়ার রাতভোর কাজ চলছে যেন তখন — মনোবিজ্ঞানী কার্ট লিউয়িন এক্কেবারে সারকথা বলেছেন, তাঁর মতে এটা একটা Marginal Man বা 'সীমানার মানুষ' হওয়ার দশা, যখন না যায় শৈশবের সবটুকু ঝেড়ে ফেলা, না পারা যায় বড়দের দলে পুরোপুরি ভিড়ে যাওয়ার সুযোগ - এতকালে অমুকবাবুর ছেলে কি অমুক মাসীর মেয়ে তখন অমুক চন্দ্র তমুক হওয়ার মিছিলে — তাই এ বয়সের সবকিছুই একটু আলাদা গুরুত্ব পাবে বই কি!

দেশে দেশে কালে কালে এই সন্ধিবেলাটিকে তাই বুঝে নেওয়ার বদলে চলে অন্ধের হস্তিদর্শন — তার যতটা না জৈবিক কারণসমৃদ্ধ তার চেয়ে ঢের বেশি সামাজিক কাঠামোর ছকে মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে ঋদ্ধ। মার্গারেট মিড-এর মত প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদকেও তাই জৈবিক ধরণের থেকে সমাজসংস্কৃতির বিষয়টিকেই এক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। কয়েকদিন আগে এক চিকিৎসক বন্ধু কৈশোরের সমস্যা নিয়ে বলার জন্য কোনো সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে আলোচনার জন্য

আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁকে জিগ্যেস করলাম, এ সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কি? তাঁর উত্তর, কেন Identity crisis ! Family -তে নানারকম adjustment problem এইসব তো আসবেই! এরপর তাঁকে জিগ্যেস করলাম, নিজের কিশোরবেলার কথা তিনি ভেবেছেন কিনা, তখন কি কোনো তথাকথিত Identity crisis তাঁর হয়েছিলো? না কি তিনি কেবল এসব বইতে পড়েছেন বা লোকমুখে শুনতে শুনতে বলার অভ্যাস হয়ে গেছে তাঁর। আমার বন্ধুটি যথেষ্ট সৎ এবং বিশ্লেষক মনের অধিকারী, কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, সত্যিই তো, ব্যাপারটাকে যত বড় করে ভেবে এসেছি তেমন তো কিছু মনে পড়ে না! তবে কি এটা রাখালের পালে পড়া কোনো কল্পিত বাঘ, যার ভয়ে আমাদের সদা উদ্বিগ্ন প্রতিক্রিয়া আর 'গেলো''গেলো' রব? আমাদের সময়েও তো চুলে 'উত্তম ছাঁট' কিম্বা 'ববি' প্রিন্টের জামা, চোঙা প্যান্ট, সরস্বতী পুজোর রাতে প্রথম সিগারেট খেতে শেখা সবই ছিলো, তবে আর ঋত্বিক রোশনের পোস্টার ছেলে ঘরে টাঙালে এত অশান্তি কেন? এবার বন্ধুটিকে আশ্বস্ত করি— ছোট থেকে এই বড় হওয়াটা তো হঠাৎ করে হয় না, প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়, তবুও এই যে নিজেকে নতুনভাবে শারীরিক, মানসিক দিক থেকে আবিষ্কারের আনন্দ, তার প্রকাশভঙ্গী এবং চারপাশের মানুষজনের উপর নির্ভর করেই অনেকসময়ই ভুলভাবে দেখা বা বোঝার ক্ষেত্রটা তৈরী হয়ে যায়, যদিও বেশির ভাগ কিশোর কিশোরীই বেশ তাড়াতাড়িই এই জায়গাটা উৎরে যায়।

জার্মান মনোবিদ স্প্রেঞ্জারের মতে কিশোরবেলার ধরণ-ধারণ অনুযায়ী এদের মোটামুটি তিনটে দলে ভাগ করা যায় — প্রথম দলটি আসে ঝড়-বাদল নিয়ে, এদের বাড়বৃদ্ধি-চাহিদা-আবেগের সাথে প্রতিপদে ঠোক্কর লাগে সমাজধরনের, তাইতেই সমস্যা। দ্বিতীয় দলটি ধীরেসুস্থে, উত্তেজনাবিহীন সামাজিক নিয়মের মধ্যেই এই সময়টা সমস্যাবিহীনই কাটিয়ে দেয় আর তৃতীয় দলটির অবস্থান প্রথম দু'টির মাঝামাঝি, অর্থাৎ প্রতিবাদ, আবেগ সবই আছে আবার সমাজ বা পরিবার ও কাছের মানুষদের সাথে বোঝাপড়াটিও অব্যাহত থাকে, তাই তেমন সমস্যাও হয় না।

বয়ঃসন্ধি বা adolescence -কে এককথায় বোঝাতে গেলে একটা অনির্দিষ্ট সময় যার শুরু শৈশবের অন্তে আর শেষ হচ্ছে পরিপূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত বয়স্কবেলায় এমনটা বলা যেতে পারে—যদিও এমন সংজ্ঞা বেশ গোলমেলে - কেননা একই সমাজে যে ছেলেটি বা মেয়েটি ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তার পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার সময়ের থেকে কম বয়স থেকেই যে ছেলেটি হাতের কাজ শিখছে বা বাবার দোকানে বসে, তার সাথে কিছু তফাৎ হয়ে যায়। আবার শৈশবের শেষ কখন হোলো তাই বা কেমন করে বুঝব? লাতিন ভাষায় 'adolescere (ইংরাজী grow up) কথাটা থেকে-এর উদ্ভব — সোজা কথায় এটা তাই 'বড় হওয়া', মোটামুটিভাবে যা এগারো থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই ঘটে যায়। বর্ণনার সুবিধের জন্য এগারো থেকে চোদ্দ বছর হল আদি, চোদ্দ-পনের থেকে সতেরো বছর হল মধ্য আর সতেরোর পর থেকে বিশ বছর অব্দি হল প্রান্তিক বেড়ে ওঠার বেলা।

এদিকে adolescence তো না হয় মানসিক পরিপূর্ণতার দিকে ঠেলে দিল, তাহলে puberty -টাই বা কি? এটা কি আলাদা কিছু ব্যাপার? খুব স্পষ্ট করে বললে এই puberty সন্ধিকালের একটা অংশ যখন শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠে একটি মেয়েকে নারী আর একটি ছেলেকে পুরুষে পরিণত করছে। ফরাসী puberte অথবা লাতিন pubertus (যা আবার puber বা adult কথাটার সাথে যুক্ত) থেকে এসেছে এই puberty, ফলে মানে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে প্রাথমিক ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে বংশবৃদ্ধির অধিকার প্রকৃতি যখন তুলে দিচ্ছে সেটাই puberty।

শুধু যে শারীরিক পরিবর্তন হচ্ছে তা তো নয় - পরিবর্তন হচ্ছে মানসিক স্তরেও, 'চৈতন্যে চাবুক' মারা বোধ আর অন্যের অসুবিধে অথবা কষ্ট অনুভব করার অনুভূতিও এই প্রথম এসে হাজির - প্রস্তুতি চলে সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের জায়গা নেওয়ার, দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার লগ্ন আসে চলে - ন্যায়নীতি বোধ মাত্রা পরিবর্তন করে, আর এ সবই চলে একই সাথে জোর কদমে, বিচিত্র বর্ণের এইসব পরিবর্তিত ধরণ না চিনে নিলে কিশোরবেলাকে তো বোঝা যাবে না। সবার আগে যে পরিবর্তন চোখে পড়ে তাকে ঘিরেও তো অনেক জল্পনা, তাই তার আলোচনাই আগে হোক—

কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভরে.....

এই এক রহস্য, শূন্য কে দিল ভরি? পদাবলীকারের প্রশ্নে যা 'না জানি দৈবের বাণী, আসি কোন্ পথ দিয়া নারিকেলে সান্ধাইল পানি?' কেউ জানে না, তবু ঘটে চলেছে ম্যাজিক। আমি নিশ্চিত সতুদা বলবেন, 'হর মন কি পিছে হরমোন হ্যায়!' শরীর মনের পরিবর্তনে হরমোনের দায় আছে বই কি! মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামের অংশ ঠেলা দেয় ছোট মটরশুটির মত পিটুইটারী গ্ল্যান্ডকে, সে আবার নির্দেশ পাঠায় কিড্নীর সঙ্গে লেগে থাকা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ডকে, আবার সেই টানেতেই দোলা লাগে, ঘুম ভেঙে মেয়েদের ডিম্বাশয়, ছেলেদের অণ্ডকোষ এবং তার সম্পর্কিত অংশের - সেক্স স্টেরয়েড - এর ক্ষরণ চলতে থাকে। পরিণত হতে থাকে যৌনাঙ্গ, মেয়েদের ক্ষেত্রে কোমর আর স্তনের বৃদ্ধি ঘটে, ছেলেদের গলার স্বর নিচু হয়, গোঁফদাড়ি গজানোর শুরুও এসময় - ছেলেমেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই বাহুমূলে কেশ, উরুসন্ধিতে যৌনকেশ-এর আবির্ভাব ঘটে - দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে অনেক পরিবর্তন আসে - ছেলেদের বেলায় টেস্টোস্টেরন এবং মেয়েদের ইস্ট্রাডিওল জাতীয় হরমোন এসবের

দায় স্বীকার করে।

পিউবার্টির পরিবর্তনগুলিতে মেয়েরা অনেক এগিয়ে থাকে। ছেলের তুলনায় মেয়েদের শরীরে এই পরিবর্তনগুলি আসে অন্ততঃ দেড়-দু'বছর আগেই। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সাধারণ পরিবর্তনের বয়সকে এগারো ধরলে, ছেলেদের তা বছর তেরো বয়স। তবে সময়ের একটু এদিক ওদিক তো হতেই পারে, আর তাতেই বাড়ে উদ্বেগ - বয়ঃসন্ধির সময়ের অনেক কিশোরকেই জানি তাড়াতাড়ি গোঁফ-এর রেখা বের করার তাগিদে লুকিয়ে বাবা-কাকার সেভিং সেট ব্যবহার করত - মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রথম ঋতুস্রাবটি হঠাৎ শুরু হয়ে গেলে (যেহেতু মেয়েরা এ ব্যাপারে এগিয়ে) অনেক আতঙ্ক-উদ্বেগের ঘটনা ঘটে এ ব্যাপারে মায়েদের ভূমিকা অনেক, যদিও আজকাল টেলিভিশন সেট মায়েদের কাজ অনেক সোজা করে দিয়েছে - আবার পিরিয়ড দেরীতে শুরু হলেও অনেক শঙ্কার অবকাশ থাকে। সচরাচর মেয়েরা এক্ষেত্রে মায়ের ধরণটিই পায় এটা মনে রাখা ভাল।

শরীরের পরিবর্তন দেরীতে এলেও যৌন উত্তেজনা কিন্তু কিশোরদের ক্ষেত্রে কিশোরীদের তুলনায় তাড়াতাড়ি আসে - শরীর নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ছেলেরাই বেশি করে - আসে হস্তমৈথুন-এর অভ্যাস, বহু বাবা-মাকে এই হস্তমৈথুন বা মাস্টারবেশন নিয়ে যেমন বিচলিত দেখেছি, তেমনি কমবয়সী ছেলেদের মধ্যেও এ নিয়ে একটা ভীষণ অপরাধবোধ দেখা যায় - সঠিক তথ্যের যোগানে অপ্রতুলতা এই অকারণ উৎকণ্ঠা বাড়ানোর জন্য দায়ী।

ফ্রয়েডের কন্যা আনা ফ্রয়েডের তথ্য অনুযায়ী নতুন আসা এই অদ্ভুত যৌন ইচ্ছে আর অপরাধবোধ কাটাতে কমবয়সীরা মোটামুটি দু'ধরণের মনের প্রতিরোধ প্রকরণ ব্যবহার করে - প্রথমতঃ তা intellectualism অর্থাৎ বিশেষ ধারণা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় বোধ বা পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এবং দ্বিতীয়ত 'এ আর এমন কি' গোছের যুক্তি দিয়ে নতুন কোনো পরিকল্পনা বা কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়ে ফেলার asceticism, যদিও এই যাবতীয় চাপা দেওয়ার শর্ত ভেঙেই মাঝে মাঝেই ফ্লিমস্টার বা মিউজিক স্টারের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া বা অন্য কিছু চলতে থাকে। কিশোরীদের ক্ষেত্রে যৌন আবেগ অন্য আবেগের সাথে যুক্ত থাকে, মেয়েরা ভালোবাসা আর যৌন আবেগ-কে একসাথে রাখলেও ছেলেরা কিন্তু দৈহিক এবং মানসিক আবেগকে আলাদা করে থাকে এটা প্রায়ই দেখা যায়।

শরীর নিয়ে তো অনেক কথা হলো, তাহলে মন, সে কি দোষ করল? তার কথা এবার বলি? প্রখ্যাত মনোবিদ জ্যাঁ পিয়াজে-র বর্ণনায় বস্তুগত জগৎ থেকে বিমূর্ত জগতে প্রবেশের সময় হল এটা — আগে জানা ছিল দুই আর দুইয়ে চার হয়, এখন দেখা গেল সেটা তিন কিম্বা পাঁচও হতে পারে — চোখে দেখা, কানে শোনার বাইরের জগৎটাও যে কখনও কখনও দারুণ সত্য,বাস্তব — এই বোধ এ বয়সে ভাবনার জগৎ দেয় খুলে, আর তার প্রতিফলন ঘটে সৃষ্টিশীলতার মধ্যে দিয়ে, গান, গল্প, কবিতা, ছবি আঁকা, বলতে গেলে সৃষ্টির কোনো অংশই আর না ছোঁওয়া থাকে না — এর সাথে থাকে একটা মহৎ কিছু করার প্রেরণা, কি করব, কিভাবে করব জানি না, কিন্তু একটা দারুণ কিছু করবই এই স্বপ্নের বোধটাই তখন সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। অনেকেই এ বয়সে ডায়েরী লিখতেও শুরু করে। আপনাকে এই জানার গন্ডীর মাঝেই এসে পড়ে বাইরের দুনিয়াও কখনও তা রাজনীতির আলোচনায়, কখনও মানবাধিকারের প্রশ্নে, কখনও বা নৈতিক ভ্রষ্টাচারিতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশে।

এরিকসন সাহেবের মতে এই বয়সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ý'ù ego identity, আমি কে? কোথা থেকে এলাম, কেনই বা এলাম, কোথায় যাব? এই নিরন্তর খোঁজাই এ বয়সের মুখ্য কাজ। এখানে identity হল একটা আত্মপ্রত্যয়ী বোধ, কিন্তু এই বোধটি তৈরী হওয়া সহজ নয় আর এটিই একজন মানুষকে অন্যের উপর নির্ভর না করেও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার রসদ জোগায়। মত প্রকাশের এই স্বাধীন, প্রত্যয়ী ভাব নতুন করে 'না' বলতে শেখায় তাদের — সে যে একটা স্বতন্ত্র মানুষ, তারও আলাদা চলার ক্ষমতা আছে, আলাদা বলার দক্ষতা আছে এটা প্রকাশের ধরণটাই এমন হয়ে দাঁড়ায় যে বাইরে থেকে মনে হয় বড়রা যা বলছেন তার উল্টো কিছু বলা বা করাই যেন এ বয়সের ধর্ম। কথা বলার ধরণই হোক কিম্বা চুল কতটা লম্বা রাখা যাবে কিম্বা কোন বন্ধুর সাথে গল্প করা যাবে অথবা যাবে না — এই সব কিছুর মধ্যেই একটা সোচ্চার উচ্চারণ থাকে যেন, 'আমিও একটা মানুষ' আর তাই কারো কথায় নয়, নিজের মতেই আমি চলব। চলতে থাকে এই নৈতিকরণের খেলা, আর 'নেতি' 'নেতি' করেই আসে 'ইতি', ফলে বাস্তববোধ আর মূল্যবোধের নানা সূত্র এসে মিশে যায় নতুন একটা চেতনার মাত্রায়, যেখানে বাস্তবকে গ্রহণ করেও সচেতন নাগরিক জীবনযাপন করা যায় — তৈরী হয় বিবেক, আর সেই সাথেই নতুনকে গ্রহণ করার মত স্থিতিস্থাপক অবস্থাও তৈরী হয়। এর আগের অবস্থায় ছিল ভয়ে ভক্তি অর্থাৎ শাস্তি পাবার ভয়ে নিয়ম মেনে চলা অথবা অন্য লোকে যা করছে তাই করে চলার মধ্যে যে একটা স্বস্তি আছে, তাই করে চলা — এখন কিন্তু নিয়মের ফাঁকফোঁকর আবিষ্কার করার চেতনা এসে গেছে, তাই নিজের নির্দ্দিষ্ট করা মূল্যবোধের মধ্যে নিজের জন্য ভাবনাকে ছাড়িয়েও থেকে যায় সকলের ভালোর কথা ভাবা। আমার বিবেক বলছে এটা করা উচিত, তাই করব, কোনো শাস্তির কথা ভেবে নয়, বা না করলে খারাপ দেখাবে, এটা ভেবেও নয়, কবির ভাষায় যা 'স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি।'

শারীরিক, মানসিক, নৈতিক চেতনার স্তরে আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে একসময় কিশোরকিশোরীদের সামাজিকীকরণ ঘটে। নাগরিক বিন্যাসে যদিও প্রাচীন বৈদিক সমাজ অথবা উপজাতীয়দের মত কোন লৌকিক সংস্কার এক্ষেত্রে চালু নেই, তবুও অসংখ্য পরোক্ষ উপায়ে কিশোরবেলার অবসানে প্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তমনস্ক সমাজে তাদের আদরণীয় গ্রহণ চলে — এভাবেই 'বাচ্চারা কেমন বড় হয়ে যায়।' তবু এই 'কবে যে হোলো বড়'র মধ্যেই নানান প্রশ্ন ওঠে, কখনও তা বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ে, কখনও পড়াশোনার সমস্যা নিয়ে আবার কখনও বা নিঃসঙ্গতাবোধের মধ্যে দিয়ে।

আগে একটা কথা প্রায়ই শুনতাম, এখনও মাঝে মাঝে শুনি, তা হল 'জেনারেশন গ্যাপ' — কয়েকদিন আগে এক মনোবিদের লেখায় একটা সুন্দর কথা পড়ছিলাম, 'জেনারেশন গ্যাপ'কে তিনি বলেছেন 'রিয়ার ভিউ মিরার' দিয়ে সামনের দিকে গাড়ি চালানো, যাতে সামনে না তাকিয়ে কেবল পিছনের দিকটুকুই চোখে পড়ে, অগ্যতা সমস্যার উদ্ভব। বিশ-তিরিশ বছর আগে আমার ছোটবেলায় আমি কেমনভাবে চলতাম, তা যদি এখনও জোর করে চালাবার চেষ্টা করি তো দু-পক্ষকেই কষ্ট পেতে হয়। আর এই তথাকথিত 'জেনারেশন গ্যাপ' আছে বলেই না সমাজ এগোচ্ছে, নয়তো তা যুগোপযোগী না হয়ে একশো বছর আগের থেকে যেত!

পরিপূর্ণতার পথের এই উত্তাল হাওয়াতেও অনেক সময় সমস্যার বীজ বোনা হয়, কাকে দোষ দেব তখন? বাবা-মা, পরিবেশ, সমাজ না কি কিশোর বা কিশোরীটিকেই? আমি এমন বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছি, যেখানে সন্তানের অকস্মাৎ আত্মহত্যার জন্য তাঁরা বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁরা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, ডাক্তারবাবু, আপনারা বলুন, কী দোষ আমরা করেছিলাম? আমি অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর সাথেও কথা বলেছি যারা নিজেদের পরিবারের মধ্যেই আলাদা দ্বীপে বাস করে—আশার কথা এর চেয়েও ঢের বেশি কিশোর বা কিশোরী তাদের জীবনপথে সুস্থ ও নিশ্চিন্তভাবেই এগিয়ে চলেছে। তবুও চিকিৎসক হিসাবে এই বয়সের মানসিক জটিলতার সাথে সাথে মানসিক অসুখগুলির সাথেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার।

কিশোরবেলার মানসিক অসুখ

প্রকৃতপক্ষে কিশোরকালের জন্য নির্দিষ্ট কোনো আলাদা মানসিক অসুখই নেই, বেশির ভাগই শৈশবের সমস্যার পরিবর্দ্ধন অথবা এমন অসুখ যা বড় বয়সেও হতে পারে। বড় বয়সের অনেক মানসিক অসুখেরই শুরু কিন্তু এই বয়সেই। অজ্ঞতা এবং মনোরোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে ভীতির ফলে চিকিৎসা থেকে দূরে থাকায় রোগটি অনেক সময় খারাপ আকার ধারণ করে। বহু সময়ে গৃহচিকিৎসক বা কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে কিশোর বা কিশোরীটিকে পাঠালেও বাবা-মা বা নিকটজন বেশ দ্বন্দ্বে ভোগেন দেখেছি, আবার কখনও ছেলেটি বা মেয়েটি নিজেই সাহায্য চায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেকেই চট্‌জলদি সমাধানের আশায় আসেন, এমন কথা প্রায়ই শুনতে হয়, 'ওর একটু টেনশন, বা একটু ডিপ্রেসন মতো আছে—একটু 'কাউন্সেলিং' না কি বলে, করে নিলে হয় না?' এই 'একটু' 'একটু'র স্বনির্মিত ধারণার বাইরে আসা দরকার—বাবা-মায়ের ধারণায় যা 'একটু ডিপ্রেসন মতো' বহু সময়েই দেখা যায় সেটা হয়ত সিজোফ্রেনিয়ার শুরু অথবা আত্মহননের পথে ছেলেটি বা মেয়েটিকে ঠেলে দেয়। খোঁজ করলে দেখা যায় সে প্রায় বছরখানেক বাড়ি থেকেই বেরোয় না, স্কুলে যায় না, আর বাবা-মা আসছেন সে পরীক্ষা দিতে কেন গেলো না তার কৈফিয়ৎ তলব করতে বছরখানেক পরে। একই অসুখ বড় বয়সের থেকে কম বয়সে বেশি ক্ষতি করে, কেননা সেখানে পড়াশোনা থেকে জীবিকা নির্মাণ সবকিছুরই ক্ষতি হয়ে যায়, সারা জীবনের জন্য রোগী হয়ে যাওয়া বা অন্যভাবে চিহ্নিত হওয়ার প্রশ্ন থেকে যায়।

বহু সময়ই ছোটদের দেখতে বসে মনে হয়েছে সমস্যাটি রোগীর নয়, যারা তাকে নিয়ে এসেছে তাদেরই—কিশোর কিশোরীটিকে দেখতে বসে বাবা-মায়ের আচরণ বা কথাবার্তা সমস্যার গোড়ায় যেতে সাহায্য করে, কিন্তু সমাধান? তা তো আর ছোটো ছেলে বা মেয়েটির ওষুধ দিয়ে হবে না।

কিশোর বয়সে যাদের মনোবিদ বা মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে আসতে হয় তাদের বেশির ভাগই পরিবারে মানিয়ে নেওয়ার অসুবিধায়, মানসিক অবসাদে অথবা আতঙ্ক উৎকণ্ঠা কিম্বা পড়াশোনার সমস্যার জন্যই আসে। এর বাইরেও অসংখ্য সমস্যা আছে, সে সব একে একে আসবে।

প্রথম মনের উদ্বেগের কথায় আসি - এই বয়সে অনেকেই আসে সদা উৎকণ্ঠা নিয়ে, যার বেশির ভাগই না ভাবলেও চলতো, সব সময় 'কি হবে' 'কি হবে' ভাব এদের স্থির থাকতে দেয় না, প্রতি মুহূর্তে নেতিবাচক চিন্তার ধাক্কা বারবার আশেপাশের লোকেদের কাছে ভরসা খুঁজে বেড়ায়, 'পারবো তো' 'ঠিক হবে তো'র মোড়কে। অনেকে আবার অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কও নষ্ট করে ফেলে। ঠিকমত স্কুল বা কলেজে যাওয়া হয় না, রাস্তায় একা বেরোতে পারে না, সমাজভীতিও চলে আসে, রাতে ঠিকমত ঘুম হয় না, খেলে হজম হয় না, শরীর দুর্বল লাগে, পড়াশোনায় মন বসে না, কেউ কেউ 'কিছু মনে রাখতে পারছি না' বলেও ভাবে। ছোট ছোট সাধারণ শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা রকমফেরকে অনেক বড় রোগের লক্ষণ বলে মনে করে অনেকে আর কল্পিত রোগের জন্য প্রতিবিধান খুঁজে বেড়ায় — ছেলেদের

মধ্যে প্রায়ই হস্তমৈথুনজনিত ভয় বা 'স্বপ্নদোষ' (Nocturnal emission) জাতীয় স্বাভাবিক বিষয়ের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং তা থেকে শরীর খারাপ হয়েছে বলে মনে করার অভ্যাস দেখা যায়।

মনের উদ্বেগের এমতাবস্থায় ওষুধ দেওয়া থেকে বুঝিয়ে বলা বা রিল্যাক্সেশন ট্রেনিং অথবা কাউন্সেলিং-এর ভূমিকা বেশি, কেননা ওষুধ উদ্বেগ কমানোর সাথে সাথেই 'রোগ' যে হয়েছে এটাই শুধু প্রতিষ্ঠা করা না উপরন্তু Anxiolytic জাতীয় ওষুধের উপর নির্ভরশীলতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

বাতিক জাতীয় রোগের (obsessive compulsive neurosis) সম্ভাবনা এই বয়সে ভালোই, খুঁতখুঁতে স্বভাব, পয়া-অপয়া, নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর নির্ভরশীলতা এসবের সাথেই বারবার হাত ধোওয়া, বারবার গুনে দেখা, একই কাজ বারবার করে চলা, মনের মধ্যে কোন 'অদ্ভুত' কথা চলে এলে, সেটিই বারবার ফিরে আসা এইসব পড়াশোনার বারোটা বাজায়, কাজের গতি কমিয়ে দেয়। ঠিক সময়ে এসবের চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

ঘরে বা বাইরে adjustment করা একটা বড় সমস্যা। পরিবেশের সাথে আমাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ এটিকে একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসেবে দেখেন, আবার কেউ বস্তুগত সাফল্যকে adjustment- এর অন্যতম পথ বলে ভাবেন - পড়াশোনা, খেলাধূলা বা অন্যদিকে ক্রমাগত অসাফল্য অনেক সময় হতাশা এনে ফেলে আত্মমূল্য কমায় এবং অন্যদের সাথে মানিয়ে নেওয়ায় অসুবিধা করে।

অনেক পরিবারেই সদস্যদের মধ্যে মৌখিক যোগাযোগ যতটা থাকে, মানসিক যোগাযোগ ততটা থাকে না, ফলে সমস্যা বা সাফল্য ভাগাভাগি করার সুবিধেটাও থাকে না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, দায়িত্ব, কর্তব্য সবই তো করছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একে অন্যকে সহ্য করতে পারছে না, এমন সম্পর্ককে ছদ্মবোঝাপড়া বা pseudo-mutual relationship বলা যায়। আবার এমন পরিবার আছে যেখানে প্রতি কথাতেই হয়ত ভাই-বোন বা দুই বোনে ঠাঁই-ঠুঁই লেগেই আছে, কিন্তু আসলে সম্পর্ক খুবই গভীর, এরা pseudo-hostile সম্পর্কের লোক, তাই মানিয়ে নেওয়ার কোনো সমস্যা নেই এখানে। কাছের মানুষের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার সঙ্গে মানসিক অবসাদও ভালোরকমই থাকে, ছোটো ছোটো বিষয় এভাবে অনেক গভীর ক্ষত তৈরী করে দেয়।

প্রায়ই দেখা যায় কমবয়সী ছেলেমেয়েদের (বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে) খুব নাটকীয়ভাবে কিছু মারাত্মক রোগলক্ষণ, প্রধানতঃ যা স্নায়ুপথবাহিত হওয়ায় কথা, যেমন, মৃগীরোগীর ফিট-এর মতন ঘন ঘন মূর্ছা যাওয়া, হাত বা পা হঠাৎ অবশ হয়ে যাওয়া, অথবা হঠাৎ করে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা দু'চোখে দেখতে না পাওয়া - এসব চলে আসে, অনেক খুঁজেও ডাক্তারবাবুরা যার কোনো শারীরিক কারণ খুঁজে পান না, কখনও হয়তো একটা ঘুমের ওষুধ বা ভিটামিন ইঞ্জেকশনেই এটা কমে গেল, এমন দেখা যায়। সাধারণত এটি 'হিস্টেরিয়া', ডাক্তারী পরিভাষায় যা Dissociative (conversion) disorder ; 'হিস্টেরন' কথাটার মানে 'জরায়ু' যা কেবল মেয়েদেরই থাকে। দেড় দু'হাজার বছর আগে থেকেই রোগটার অস্তিত্ব প্রমাণিত - তখন মনে করা হত জরায়ুটি শরীরের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানে আটকে যাচ্ছে, তেমন তেমন রোগলক্ষণ দেখা দিচ্ছে, আজ কে না জানে 'হিস্টেরিয়া' মেয়েদেরই হয়। এখানেও আপত্তি আছে, conversion disorder হল এমন একটা মনের অসুখ, যেখানে ভেতরকার উদ্বেগ প্রকাশ না করতে পারায় তা শারীরিক রোগলক্ষণের নাটকীয় প্রকাশের মধ্যে আসে। ফলতঃ কেবলমাত্র উদ্বেগেই যে মনোযোগ পায় তাই নয় রোগীর কিছু বাড়তি সুবিধাও অনেকসময় এসে যায়— পরীক্ষার জন্য উদ্বেগ থেকে এমন লক্ষণ হয়তো পরীক্ষা দেওয়াটাই বন্ধ করে দিল, কিন্তু তারপর? ছেলেদের উদ্বেগ হয় না কে বলল, আর তাদের বলা এমন রোগলক্ষণ কম হলেও একেবারেই হয়না তাও নয়, আসলে এখানেও রোগ নির্ণয়ে লিঙ্গ বৈষম্য কাজ করে, মেয়েদের বেলায় কাছাকাছি কোনো রোগ লক্ষণ হলেও রোগটি 'হিস্টেরিয়া' ঘোষণা করাটা যে দ্রুততার সাথে করা হয়, ছেলেদের ক্ষেত্রে তা করতে অনেকবার ভাবতে হয়। এর পিছনে যে দীর্ঘকালীন চিকিৎসা সংস্কার কাজ করে তা হল এটি কমবয়সী মেয়েদেরই রোগ। শেষ পর্যন্ত যে চিকিৎসা তার দরকার ছিল তা হয় না — প্রয়োজন ছিল উদ্বেগের কারণটা বোঝা এবং সমাধান করা, কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপীরও দরকার ছিল — তা না হয়ে এটা হয়ে দাঁড়ায় চিকিৎসকদের 'হিস্টেরিয়া' ঘোষণার নিশ্চিন্ততায় আর বাড়ির লোকের সেটি অপ্রমাণ করার জন্য দৌড়ে। আসলে তো কোনো লড়াই এখানে থাকার কথাই ছিল না, ছিল ছোট্ট মনটিকে বুঝে নেওয়ার প্রশ্ন।

সমীক্ষা অনুযায়ী কিশোর বয়সের মানসিক সমস্যার অন্ততঃ পঁচিশ শতাংশই মানসিক অবসাদ — অল্পমাত্রায় বিষন্ন ভাবকে হিসাবে আনলে হয়তো আরো বেশীই হবে তা। খুব কম বয়সে মন খারাপ হলেও তা প্রকাশ করার মত পরিণতি থাকে না, তাই বয়ঃসন্ধির আগে অবসাদের তেমন বড় ঘটনা সেভাবে দেখা যায় না। যদিও কিশোর কিশোরীরা তাদের গভীর আবেগ-অনুভূতির বিষয়ে তেমন একটা মুখ খুলতে চায় না, তবুও অবসাদের ফলে যে ভেতর থেকে ফাঁকা হয়ে যাওয়া একটা ভাব আসে অথবা নিরুত্তাপ, নিরাসক্ত ভাব বাসা বাঁধে সেটা অনেকসময় স্পষ্টই বোঝা যায়। আবার কখনও অবসাদের প্রকাশ হয় অস্বস্তিকর বিরক্তভাবে, কিছুতেই যখন ভালো লাগে না, মনস্থির রেখে কোনো কিছুই করতে পারা যায় না, ফলে

একটা ছেড়ে অন্যটার দিকে মন ছোটে, ক্লান্তি আসে, শরীর সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানো শুরু হয়।

বড়দের অবসাদের মতই ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা মানসিক অবসাদে বেশি ভোগে। এটা যে একটা মানসিক রোগ সে ধারণা তৈরীর আগেই বহু সময় পড়াশোনা থেকে শুরু করে অনেক ক্ষতিই হয়ে যায় — কিন্তু মানসিক অবসাদ যে এ বয়সে কেমন ক্ষতি করতে পারে তা প্রত্যেকদিনের সংবাদপত্রে চোখ বোলালেই বোঝা যায়। ঘনিষ্ঠজনের সাথে সম্পর্কের অবনতি, বাড়ির পরিস্থিতি, ঝগড়াঝাঁটি, স্কুলের বা কলেজের পড়াশোনার অবনতি, আকস্মিক মনে আঘাত, বন্ধু বা বান্ধবীর সাথে মনোমালিন্য, অন্য লোকের সামনে অপদস্থ হওয়া, ঝোঁকের মাথায় কাজ করার প্রবণতা — এ সবই অবসাদের সঙ্গে অথবা অবসাদবিহীন অবস্থাতেও আত্মহননের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়।

তেরো বছরের মেয়ে কাজরী, সারাদিন অপেক্ষার পরও যখন কয়েকদিনের আলাপ হওয়া বন্ধুটি ভ্যালেন্টাইনস্ ডে-র কার্ড পাঠালো না, তখন কাউকে কিছু জানাতে না দিয়ে গায়ে আগুন লাগালো, তীব্র অভিমান আর পরিবারের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ঘাটতি ছিল, যে কয়েকদিন সে বেঁচে ছিল তখনও বাঁচার তীব্র আকুতি ছিল, কিন্তু সে বাঁচেনি।

বেশীক্ষণ টিভি দেখে সময় নষ্ট না করে মাধ্যমিকের পড়াটা পড়া উচিত, মায়ের এ হেন কথাবার্তায় আহত হয়ে, নিজের সালোয়ার-কামিজের ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়ল বর্ণালী, সে অবশ্য বেঁচে যায়।

আবার সুমন চায়নি কেউ কোনভাবে আঘাত পাক তার কাছে, ধীরে ধীরে সে-ই সরে আসছিল বাবা-মা-বোন-বন্ধুদের কাছ থেকে। একদিন সে যখন মায়ের অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ একসাথে খেয়ে নিল, তাকেও ফেরানো যায় নি।

আমরা মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা কিম্বা ওদের কাছের মানুষের দল কি ভীষণ অসহায় বলুন তো এখানে? বহুসময়েই সত্যি সত্যি মরে যাবার ইচ্ছের থেকেও নিজের সমস্যার দিকে কাছের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও একটু নিরুপায় চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় — আর সেই চেষ্টাই কখনও বা কাল হয়ে যায়। নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেও যারা আত্মহননের চেষ্টা করে অথবা কখনও বেশ কিছু ওষুধ খেয়ে নেয়, কখনই তাদের এইসব প্রচেষ্টাকে হাল্কাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

মানসিক অবসাদের উল্টোদিকে অকারণ উৎফুল্লতার রোগও (ম্যানিক ডিপ্রেসিভ অসুখের ম্যানিক দশা) কিশোরবেলায় শুরু হয়ে যেতে পারে। প্রথমদিকে এই অবস্থায় অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলা, বড় বড় কথা, গুরুজনদের অমান্য করা দেখে অনেকেরই আচরণগত সমস্যার বাড়াবাড়িই মনে হতে পারে।

আচরণগত সমস্যা এই বয়সের আরেকটা দিক যা শৈশবের আচরণের সমস্যার পরিবর্দ্ধিত রূপ হয়েও আসতে পারে। দিনের পর দিন, বিভিন্ন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক মনোভাব, ঝোঁকের মাথায় কাজ কিম্বা এমন আচরণ যা এ বয়সের প্রচলিত সব নিয়মকানুনের বাইরে চলে যায়। কখনও তা স্কুল ছাড়িয়ে পথে, কিম্বা পরিবারের গন্ডী ছাড়িয়ে পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে অসুবিধে তৈরী করে, কখনও কখনও থানা-পুলিশ হওয়ার উপক্রমও হয়। পরিবারের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম, অন্যদের সাথে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, টাকাপয়সা চুরি করা, আরো ছোটখাটো অপরাধ, নেশার অভ্যেস, অপরাধী দলের সাথে মেশা এসবও ঘটতে থাকে।

প্রথম নেশা তা সিগারেট বা অ্যালকোহল — যাই হোক, শুরু হয় কৌতুহল থেকে, সচরাচর বন্ধু সংসর্গে। আজকাল এসব ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়মও কিছুটা শিথিল, মিডিয়া অনেক উচ্ছল আর অজুহাতও প্রচুর। তবে সমস্যা হয় তখনই যখন মাঝে মধ্যের কৌতুহল নির্ভরশীলতার জায়গায় পৌঁছে দেয় — এভাবেই এসে পড়ে গাঁজা-ভাঙ বা সিদ্ধির নেশা, ঘুমের ওষুধের নেশা, কখনও বা হেরোইন জাতীয় মাদকের নেশা। কাশির সিরাপ, যাতে কোডিন থাকে, তার নেশাও এ বয়সে খুবই প্রচলিত। ইঞ্জেকশন-এর মাধ্যমে নেশা করা থেকে এইড্স বা হেপাটাইটিস-বি-র মত রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সিজোফ্রেনিয়া, এই মারাত্মক মানসিক ব্যাধিটির শুরুও কিন্তু এ বয়সেই। সচরাচর অলীক শ্রবণ বা দর্শন, ভ্রান্ত ধারণা, উত্তেজনা এবং অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে দিয়ে এ বয়সে রোগটি প্রকাশ পায়। ঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিণতি ভালোর দিকেই যায়।

ব্যক্তিত্বের বিচলনের শুরুও এই বয়সেই হয়, কারণ ব্যক্তিত্ব সংগঠন ক্রিয়া শৈশব থেকে শুরু হলেও এই বয়সেই তা দানা বাঁধে। এছাড়াও নানান সমস্যা আছে — আছে ফিগার সচেতনতা আর কখনও তার থেকেই না খেয়ে চলার অসুখ অ্যানোরিক্সিয়া নার্ভোসা, আছে নানান ঘুমের অসুখ, আছে অন্য শারীরিক অসুখের সঙ্গে তার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় নাজেহাল হওয়া, এর কী শেষ আছে?

কিশোরবেলা নিয়ে যতটা উদ্বেগ তার অনেকটাই বয়েসটাকে না বোঝার জন্য, সমাধানও তাই হাতের মধ্যেই আছে। আর এই 'না বোঝা'টাই বা কতটা সত্যি? প্রত্যেক বাবা-মা-ই তো বয়েস পার করেই এসেছেন, তাঁরা তাঁদের সন্তানকে ভালোবাসেন না এমনও তো নয়? সমালোচনা আর ভারসাম্য বজায় রাখা কি এতই শক্ত? ছেলে মানুষ করা মানে যদি কেউ পলতেয় করে সারাজীবন দুধ খাইয়ে যাবেন বলে ভেবে থাকেন, সেটা যেমন ভুল, তাকে বুঝতে না পেরে শুধু তথ্য আর কাঠিন্য দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখাও তেমনই

ভুল। মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে উৎকণ্ঠ বাবা-মাকে দেখতে দেখতে তাই মনে হয়, হয়ত এও এক ফ্যাশন। যে কথাগুলি তাঁরা বুঝিয়ে বলছেন, তা কি এইসব বাবা-মায়েরা তাঁদের মত করে শুরুতেই বোঝাতে পারেন না? যে সন্তানের সবচেয়ে বড় শিক্ষক তাঁদের হওয়ার কথা আজ তাকেই তাঁরা ভয় পেতে শুরু করেছেন।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ছে এক'দেড়শ বছর আগে একজন জেদী বাঙালীর লেখা একটি চটি বইয়ের খলনায়ক এক কিশোরের কথা, যে তার মাসীর কাছে বড় হয়েছিল, স্কুল থেকে কিছু চুরি করে আনলেও মাসী কিছু বলতেন না, ক্রমে সে বড় চোর হল, ধরা পড়ল, ফাঁসির হুকুমও হল — ফাঁসির আগে সে তার মাসির কান কামড়ে ধরে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে মাসির এখন আর কান্নাকাটির কোন মানেই নেই — ছেলেটির নাম ভুবন, আর তার স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুবনরা কিন্তু আজও আছে, আছে গোপালের মতই প্রায় সুবোধ বালকও, আজকের যুগে ঈশ্বরচন্দ্র থাকলে হয়ত সৃষ্টি হত মালতী কিম্বা সবিতাদেরও, যাদের কেউ শিষ্ট, কেউবা তা নয়। সেদিনের ধারাপাত, আদর্শলিপি আজ ইন্টারনেটে ভরসা পায়, তবু ভাবতে খারাপ লাগে, এখনও ভালো কিছু করতে গেলে ঐ ভুবনদেরই 'কান কামড়ানো'র অপেক্ষায় থাকতে হয় আমাদের।

সময় ও শৈশব

প্রণব কুমার দাস

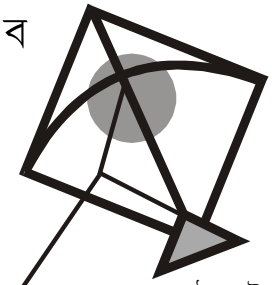

প্রশ্বাসে চাই মুক্ত বাতাস
অক্সিজেন বিষে ভরা
কোথায় পাবো নীল আকাশ
কংক্রিটে আড়াল করা।

খেলবো কোথায় মাঠও নাই
কম্পিউটারে বসে পড়া
লেখাপড়ার ভীষণ চাপ
বইয়ের ভারে নুয়ে পড়া।

হারিয়ে গেছে ডাংগুলি, লাট্টু, গুলি
আকাশেতে ঘুড়ির মেলা
এখন, খেলা মানে এ্যাকাডেমিতে
ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস খেলা।

যুগে যুগে শৈশবগুলো
ধীরে ধীরে পালটে যায়
গল্প শুনি, পাই না খুঁজে
বাবার সাথে মিল কোথায়?

বাবার শৈশবে চাপ ছিল না
স্বাভাবিকতায় অভ্যস্ত
আমরা এখন শিশু থেকেই
প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত।

শুধুই সেরা হওয়ার ইঁদুর দৌড়
সবাই সেরা হতে চায়
সেরা তো হবে একজনই
একথা কাকে কে বোঝায়?

বিজ্ঞান এগোয় পৃথিবী এগোয়
শৈশব এগিয়ে চলে
সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে
ক্রমে ক্রমে, পলে পলে।

জ্ঞান ফিরুক

লমা রমা কুৎনস্

মাগো, মা আমার, আমি তোরই অভিশপ্ত সেই শিশুকন্যা!
দশ মাস দশ দিন অশেষ কষ্ট স্বীকার করে, পেয়েছিস কত বেদনা।
তুই ছাড়া আর আপনজন বল এ জগতে আর কে আছে মাগো,
কন্যার আর্তনাদ, তুই ছাড়া পরিবার-সমাজ যে শোনে না তাই জাগো।
কন্যা বলেই যত বিপদ আপদ জুলুমের শিকার হয়েই মরি,
প্রকৃতির কোলে বড় হবারও স্পর্ধা রাখি কই, শুনি দে গলায় দড়ি।
সকলের চোখে আগুন দেখি, হাত করে নিশপিস খতম করবে বলে,
তাতে কি হচ্ছে ভালো, জমকালো-গুণ্ডা মস্তান নিধন যজ্ঞ চলে।
তাই এদেশে শিশুপুত্র পিছু, শিশুকন্যার সংখ্যা অবাধে কমে যায়,
সামাজিক ভারসাম্য সুরক্ষিত না হলে, মানব সমাজ কি রক্ষা পায়।

ছবি ঃ শাশ্বত দাস

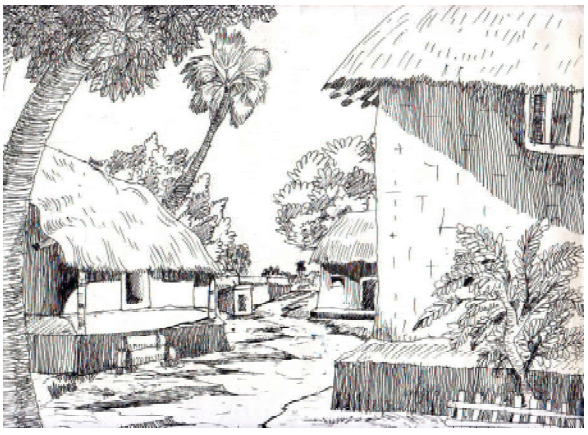

শৈশবের বৈশিষ্ট্যই কি উত্তরকালের পরিচায়ক

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

যে কোন মানুষের সমগ্র জীবনে শৈশবের সময়টুকুই হল সবচেয়ে সুখের - শৈশব ছাড়িয়ে বয়স যত বাড়ে মানুষের দায়িত্বও বাড়ে স্বাভাবিক কারণে ফলে বহু কাজের মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে মানুষ — কতকটা পরাধীনতার মত। আর কে না জানে একমাত্র শৈশবই হল জীবনে স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণের প্রকৃষ্ট সময় - বাধা - বন্ধ - হীন, 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'। তাই বেশী বয়সে কখনও যদি শৈশবের দিনগুলি নিয়ে আলোচনা হয়, যে কোন মানুষ নষ্টালজিক হয়ে পড়ে - সকলেই প্রায় একবাক্যে মেনে নেয়, ওসব দিন আর ফিরে আসবে না, কি ছিল আহা .. ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথচ সবারই যে ছেলেবেলাটা একইরকম কাটে তা নয় — বিভিন্ন মানুষের ছেলেবেলা বিভিন্ন - কেউ দুরন্ত, কেউ শান্ত, কেউ কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে, কেউ সোনার চামচ মুখে জন্মেছে, কেউ অসম সাহসী, প্রায় সকলেই খেলাধূলায় অংশ নেয় - সে গুলিখেলাই হোক আর ফুটবল - ক্রিকেটই হোক - বাবা মার বকুনি - স্কুলে শিক্ষকদের ধমকানি এসব তো প্রত্যেকেরই শৈশবের অলংকার — আর এসবই জীবনে বেড়ে ওঠাতে, বড় হতে ভিত্তি তৈরি করে দেয় বরং বলা ভাল - ভবিষ্যৎ জীবনের ছন্দ বেঁধে দিতে সাহায্য করে।

আমরা দেখে নিই বাঙলার বেশ কিছু প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের শৈশব কেমন ছিল। প্রত্যেকেই আমাদের কাছে পথচলার আদর্শ অথচ এঁদের ছেলেবেলায় কি বিভিন্নতা। ছেলেবেলায় ভীষণ দুরন্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই (১৮২০-১৮৯১)। ছোটখাটো চেহারার বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দুষ্টুমিতে বাড়ির লোক, পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে যেতেন - কিন্তু বুদ্ধি টনটনে। মা ভগবতী দেবীর আদেশ নির্দেশই ছিল তাঁর কাছে শেষ কথা। একই রকম দুরন্ত, ডানপিটে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৬৩-১৯০২), দুরন্ত-সাহস, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ছেলেবেলায় ধ্যান করতে গিয়ে জঙ্গলে সাপ খোপের পাল্লায় পড়েও তাঁর ধ্যান ভাঙে না, অথচ তাঁর বন্ধুরা ভয়ে পালায়। এমন, অসংখ্য ঘটনার সমারোহে নরেনের (বিলে) ছোটবেলাটি পরিপুষ্ট ছিল। এই সাহস এই তেজ এবং অস্বাভাবিক স্মরণ শক্তি তাঁকে ভবিষ্যতে ভারত পথিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আমরা দেখেছি এমনই দুরন্ত শৈশব এক বিপ্লবী মেয়ের জীবনে - তিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২), যদিও পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবীরাই অসম সাহসী হন, দুরন্ত হন। প্রীতলতা কিন্তু পড়াশুনায় মোটেই ফাঁকি দেন নি দেশের কাজ করতে গিয়ে। আই.এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। মাস্টারদা সূর্যসেনের নির্দেশে তিনি চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে বীরাঙ্গনার মৃত্যু বরণ করে নেন — তখন তো সবে শৈশবকে পার করেছেন তিনি। সাহিত্যিক বনফুলও (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৯-১৯৭৯) ছিলেন বেশ ডানপিটে, তাঁর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায়, তাঁর ছেলেবেলা ছিল বেশ বর্ণময় — শৈশবকে তিনি, সম্পূর্ণরূপেই উপভোগ করেছিলেন — দুষ্টুমি বুদ্ধিও কম ছিল না। তাঁর নিজের কথায় শুনি ঃ

> ''তখন আমি স্কুলে পড়ি। মা কলিকাতা হইতে মামাবাবুকে দিয়া একবার একটি বড় টিয়াপাখি কিনিয়া আনাইলেন। ... আমার সহিত খুব ভাব হইয়া গেল। .... এইভাবে বেশ চলিতেছিল। কিন্তু একদিন আমার দুর্বুদ্ধি হইল। আমার বইয়ের শেলফে ও পড়িবার টেবিলে রং করিবার জন্য স্টীমারের সারেং আমাকে কিছু লাল রং দিয়া গেল একদিন। আমার শেলফে এবং টেবিলে লাগাইবার পরও কিছুটা রং বাঁচিয়া গেল। আমার মনে হইল পাখির খাঁচাটাতেও যদি রং লাগাইয়া দিই কেমন হয়? লাল খাঁচায় সবুজ পাখি তো চমৎকার দেখাইবে। আমি সমস্ত খাঁচাটায় লাল রং মাখাইয়া দিলাম। তাহার পর স্কুলে চলিয়া গেলাম। স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখি দুর্গাদাস খাঁচার মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে। মা বলিলেন — কি করেছ দেখ। খাঁচায় রং লাগাতে কে বলেছিল তোমায়? সমস্ত দুপুর পাখিটা ওই রং চেটে খেয়েছে। বিকেলে দেখি মরে পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় বিষ ছিল ওই রঙে। তোমার ঐ শেল্‌ফ আর টেবিলও ফেলে দাও। নতুন শেল্‌ফ আর টেবিলও মা পুড়াইয়া ফেলিলেন। ইহার পর আর কোনও পাখি পুষি নাই। মা আর পুষিতে দেন নাই।''

ছোটবেলায় এসব দুষ্টুমি অতি স্বাভাবিকই ছিল, তা বলাই বাহুল্য। তেমন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তো ছেলেবেলায় আরও দুরন্ত ছিলেন — এতটাই ডানপিটে আর দুরন্ত, যে বাড়ির লোক থেকে পাড়ার লোক, স্কুলের সহপাঠি, শিক্ষকেরা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যেতেন শরৎচন্দ্রের দুষ্টুমিতে। ছেলেবেলায় দেবানন্দপুরে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেন বটে, তবে পড়াশুনায় একদম

মন নেই, আনমনাভাবাপন্ন সহপাঠি বন্ধুদের নিয়ে স্কুল পালিয়ে সারাদিন মাঠে ঘাটে জঙ্গলে টো টো করে ঘুরে বেড়ানো চলে আর নদীতে ছিপ ফেলে ছোট ছোট মাছ ধরার আনন্দে পড়াশুনা মাথায় ওঠে - চলে বনে বাদাড়ে ঘুরে ফড়িং ধরা — তার পায়ে সুতো বেঁধে নিজের সঙ্গে নিয়ে ছোটাছুটি করা। গ্রামের লোক অতিষ্ঠ — শরৎ এই ফল চুরি করেছে, এই ফুল চুরি করেছে। তাই গ্রামের সম্পন্ন লোকেদের কাছ থেকে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে, সহপাঠিদের কাছ থেকে প্রায় রোজই শরতের বাবার কাছে অভিযোগ জমা পড়ছে। এসব সত্বেও কিন্তু স্কুল পড়ুয়া শরৎ পরীক্ষায় বেশি বেশি নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। কে না জানে শরতের ছেলেবেলায় এই বিশাল অভিজ্ঞতাই পরবর্তীজীবনে তাঁর লেখালিখির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল - আর তা ইতিহাস হয়ে গিয়েছিল।

সদ্য প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে (১৯১৯ - ২০১৩) কিন্তু ছেলেবেলায় এমনই দুরন্ত ছিলেন। তাঁর নিজের কথায় শুনি ঃ

> ‘‘ছোটবেলায় ছিল আমাদের এক ডাকসাইটে গ্রুপ, যাদের কাজই ছিল নানা জায়গায় উৎপাত করে বেড়ানো, কারণে অকারণে অন্য দলের সঙ্গে মারামারি করা এবং বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে ফুটবল এবং অন্যান্য খেলা খেলতে যাওয়া। কী জানি কেন - ছোট থেকেই আমার মধ্যে একটা নেতা সুলভ ব্যক্তিত্ব ছিল। আপসহীন নেতৃত্ব দিতাম আমি সেই দলের। অন্য কোন বেপাড়ার ছেলেরা কিছু বললে বা মন্তব্য করলে আর রেহাই ছিল না তাদের। সদলবলে গিয়ে মারধর করে আসতাম তাদের কোনওরকম আপস মীমাংসা ছাড়াই। আমাদের দলকে সবাই ভয় করে চলত। কেউই সে রকম ঘাঁটাতে সাহস পেত না। আর সেটাই ছিল আর এক বিপদ। অনেকদিন কোন মারামারি না করলে গায়ের রক্ত যেন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হত। আর তাই বিনা কারণেই অন্য কোনও দলের সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধাতাম।’’

হ্যাঁ, মান্না দে ছেলেবেলায় এতটাই দুঃসাহসিক, দুরন্ত ছিলেন, যত রকম দুষ্কর্ম সবই করতেন অবলীলাক্রমে — কাউকেই ভয় পেতেন না, একমাত্র তাঁর মেজকাকা হেমচন্দ্র দে ছাড়া — বহুবার তাঁর কাছে আগাপাস্তলা মার খেয়েছেন — প্রতিবার তাঁকে বাঁচিয়েছেন ছোট কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে কত যে বদমায়েশি করেছেন মান্না দে, তার ইয়ত্তা নেই। যে কোন পরিবারেই এমন যুগপৎ ঠ্যাঙানি এবং ভালোবাসার উপস্থিতির অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই রয়েছে তাদের শৈশবকালে।

শৈশবের দুরন্তপনার আর একটি উদাহরণ দেবো, সেটি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের (১৮৪৭-১৯১৯)। তিনি দুষ্টুমির সাথে সাথে অশ্লীল কথাবার্তাও বলতেন আর তার জন্য মারও খেয়েছেন প্রচুর। তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক ঃ

> ‘‘ মা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার মেশা পছন্দ করিতেন না। তখন পাড়ার ছেলেরা যে কি খারাপ কথা বলিত ও খারাপ কাজ করিত, তাহা স্মরণ করিলে লজ্জা হয়। গালাগালি বৈ তাহাদের মুখে ভাল কথা ছিল না। অধিকাংশ ছেলে রাগিলেই তাহাদের মাকে পাঁটা বলিত। আমাদের প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি জেঠার ছেলেমেয়েরা মাকে এত পাঁটী পাঁটী বলিত যে, তাদের একটি বোনের মা মা বলার পরিবর্তে পাঁটী পাঁটী, বলিয়াই কথা ফুটিল। সে মাকে না দেখিতে পাইলে ‘পাঁটী, ও পাঁটী করিয়া কাঁদিত। সেই কুসঙ্গের মধ্যে আমার মা যে আমাদিগকে কিরূপে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একবার পাড়ার এক ছেলের মুখে তাঁর মার প্রতি বাপান্ত গালি দিলাম। আর কোথায় যায়। মা আমাকে ধরিয়া দুইখানা খোলার কুচি একত্র করিয়া আমার গালের মাংস ছিড়িয়া ফেলিলেন, রক্তে মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে কয়েকদিন আহার বন্ধ হইল, মা আমার গলায় গলান ভাত ও দুধ ঢালিয়া দিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি জননীর প্রতি গালাগালি আমার মুখে কেহ কখনও শোনে নাই।’’

হ্যাঁ, কে না জানে এই শিবনাথ শাস্ত্রী উত্তর জীবনে কতবড় মাপের মানুষ হয়েছিলেন - কতবড় কবি, সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবে।

আবার এই দুরন্তপনার উল্টোটাও আমরা দেখেছি বেশ কিছু মনীষীর শৈশব জীবনে। স্কুলজীবনে সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-?) কিন্তু বেশ শান্ত -শিষ্ট, সরল সাধাসিধেই ছিলেন — তবে খুব দৃঢ়চেতা ছিলেন — অমায়িক ব্যবহার, পড়াশুনায় ডুবে থাকা, বাঙালী পোশাক পরিধান করে ভারতীয়ত্বকে সন্মান জানানো, এসবই ছিল তাঁর শিক্ষক বেণীমাধব দাসের জীবন থেকে পাওয়া। কে আর জানতো এই আপাত শান্ত সরল বালকটিই পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ দেশনায়ক হয়ে উঠবেন, উত্তাল যুদ্ধে অংশ নেবেন — আপামর দেশবাসী তাঁকে নেতাজী রূপে বরণ করে নেবে।

এই একই শৈশব আমরা পাচ্ছি দেশবরেণ্য বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) জীবনে - সরল-অনাবিল। আমরা তাঁর ছেলেবেলার কথা তাঁর মুখ থেকেই শুনি ঃ

> ‘‘পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাবা আমাকে দেবতার মতন

পূজা করিয়া ছিলেন। আমি যখন যাহা চাইতাম তখন তাহা পাইতাম, কোনদিন আমার গায়ে বাবা হাত তুলেন নাই, অন্য কাহাকেও তুলিতে দেন নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহার বৈঠকখানায় আমাকে একটা ''পলো'' চাপা দিয়া রাখিয়া কাছে বসিয়া নিজের কাজ করিতেন। নিজের হাতে আমাকে স্নান করাইয়া দিতেন, নিজের পাতে বসাইয়া খাওয়াইতেন। তাঁহাকে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে দেখিয়া আমিও সন্ধ্যা-আহ্নিক করিব বলিয়া বায়না করিলাম। তখন আমার জন্য ছোট কোষাকুষি, ত্রিপদ রেকাবী, ঘন্টা প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম বাজার হইতে আসিল। আমিও বাবার কাছে বসিয়া কোষাকুষি লইয়া ঘন্টা বাজাইয়া 'পূজা' করিতে লাগিলাম।'

তিনি আর এক জায়গায় লিখছেন ঃ

''মনে পড়ে যে প্রতিদিন অপরাহ্নে মা আমাকে কাপড় চোপড় পরাইয়া কাছারীতে বাবার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। আমি সেখানে যাইয়া তাঁহার এজলাসে উঠিয়া তাঁহার কাছে একটা চৌকিতে বসিয়া নীরবে বাংলা গভর্নমেন্ট গেজেট খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতাম বা পড়িবার ভান করিতাম। এইরূপে আমার শৈশব শিক্ষা আরম্ভ হয়।''

ছেলেবেলায় একই রকম শান্ত শিষ্ট ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)। শৈশবের অরবিন্দকে দেখে বোঝা দুঃসাধ্য উত্তরকালের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, ইংরেজ সরকারের ত্রাস অরবিন্দকে। ছেলেবেলায় প্রায় পুরোটাই লন্ডনে পড়াশুনা করেছিলেন। শান্ত স্বভাবের অরবিন্দ ছিলেন অসম্ভব মেধাসম্পন্ন, ক্লাসে তিনিই প্রথম হতেন। পড়াশুনাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান, বাংলা জানতেন না সে সময়, ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও তাঁর শিক্ষা ছিল। নিজে ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। এই এমন সুবোধ বালকই কিনা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন।

এবার আমরা দেখি বাল্যকালে যে বিষয়ের উপর দক্ষতা বা ঝোঁক দেখা গেল উত্তরজীবনে প্রতিভার বিকাশ ছিল সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে এমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) শৈশব থেকেই অসম্ভব মেধাবী ছিলেন। যা একবার পড়তেন ভুলতেন না। মাত্র ১১ বছর বয়সেই বঙ্কিমের বিয়ে হয়ে যায় মাত্র ৫ বছর বয়সী এক ছোট মেয়ের সঙ্গে। এমন শৈশবেই বিয়ে অবশ্য ওই যুগে আকচারই ঘটতো, যা এযুগে অপরাধ বলেই গণ্য হবে। বাংলা সাহিত্যকে যিনি শক্ত গ্রানাইট পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর অসাধারণ সব বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টিতে, যা তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে ভাবাই যেত না প্রায়, সেই বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সাহিত্যকর্ম শুরু করেছিলেন বালক বয়েস থেকেই আর তাঁর আদর্শ ছিল কবি ঈশ্বরগুপ্ত। এমনকি ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে তিনি ছেলেবেলায় কবিতা লিখে পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

ঠিক একইরকম শৈশব দেখেছি আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ক্ষেত্রেও (১৮৭০ - ১৯২৫)। চিত্তরঞ্জন প্রথম দিকে নিয়মিত কাব্য রচনায় মেতে ছিলেন। এমনকি ব্যারিস্টারি পাশ করার পরও। অসম্ভব সুখপাঠ্য কবিতা তাঁকে সে যুগে কবি হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বিদ্বজ্জনেরা তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে কবিতার কল্পলোকের মায়া ত্যাগ করে সম্পূর্ণ রূঢ় বাস্তব আইন আদালত সম্পর্কীয় পেশায় আত্মনিয়োগ করলেন। আর কে না জানে অতবড় ডাকসাইটে ব্যারিষ্টার সে যুগে সমগ্র দেশেই বিরল ছিল। আলিপুর বোমার মামালায় বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে মামলা লড়েই তিনি সারা ভারতে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

আবার প্রখ্যাত এবং ভারতবিখ্যাত ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত (১৯১২ - ১৯৯১) কিন্তু ছেলেবেলায় সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি ছোটবেলায় গান বাজনা নিয়েই থাকতেন পারিবারিক ঐতিহ্য মেনেই। তাঁর বাবা এসরাজ বাজাতেন। প্রদোষ দাশগুপ্ত একস্থানে লিখেছেন ঃ

''যদিও ছোটবেলা থেকেই গান এবং ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক ছিল বেশী। ভাস্কর্যের ক্ষেত্র আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন এবং অচেনা ছিল। ... পারিবারিক সংস্কৃতি আমাকে যথেষ্টভাবে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। আমি ১৯৩৭ সালে বিলেতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত নিজে গান রচনা করে তাতে সুরসংযোগ করে কলকাতা রেডিওতে গান গেয়েছি। আমার রচিত গান আমার ছোট ভাই-বোনেরাও রেডিওতে গেয়েছে।''

এহেন সঙ্গীতশিল্পী প্রদোষ দাশগুপ্ত উত্তরকালে হয়ে উঠলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভাস্কর।

এমনটা ঘটেছে কিন্তু ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) জীবনেও। শৈশবে চোখের দৃষ্টিতে সমস্যা থাকার কারণে খেলাধূলা বেশি করতে পারেননি। যখন ওঁর বয়সী ছেলেরা খেলতে যাচ্ছে, ছোটাছুটি করছে, তখন সুনীতি বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন অথবা একমনে ছবি এঁকে চলেছেন। হ্যাঁ, শৈশবে তাঁর প্রতিভা ফুটেছিল ঐ চিত্রাংকনের মধ্যেই, কে আর জানতো উত্তরকালে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিদ হয়ে উঠবেন রং তুলি ফেলে রেখে।

এবার আমরা দেখি শৈশবে প্রথাগত শিক্ষায় বিদ্যালয়ের গন্ডি না পেরিয়েও সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনে যাঁরা আমাদের আদর্শ হয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) বিদ্যালয়ে ভর্তি

হলেও এমন প্রথাগত শিক্ষা পছন্দ করেন নি। বাল্যকালে তাই বাড়িতেই শিক্ষকদের কাছে তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, অংক ইত্যাদি পড়েছেন। ভারতের প্রথম নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে বিচরণ কিন্তু সর্বত্রগামী। এমন আর একজন হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯১-১৯৭৬)। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ না করেই চলে গেছিলেন সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে। এই দুই প্রথাগত শিক্ষা-বিহীন কবি সাহিত্যিক দুই দেশের জাতীয় কবি। এঁরা বিদ্যালয়ের গন্ডি না পেরোলেও এঁদের লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরেই কিন্তু পড়ানো হয়।

আবার স্কুলজীবনে অর্থাৎ শৈশবকালে কেউ কেউ খুবই সাধারণ ছাত্র ছিলেন - চোখে পড়ার মত নয়, অথচ উত্তরকালে তারাই হয়ে উঠলেন পৃথিবীবিখ্যাত। এমন তো দুজনের নাম করা যায়। প্রথমজন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। ছাত্রজীবনে প্রফুল্ল খুব বেশি নজরে পড়তেন না, বরং বলা ভাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় খারাপ ফল হয়েছিল। এরপরে পরেই ক্রমশঃ তাঁর প্রতিভা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে, তা আমরা সবাই জানি। আর একজনের নাম করবো তিনি হলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২)। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হিসেবে অর্থাৎ তাঁর ছেলেবেলায় তিনি কিন্তু অতীব সাধারণ ছাত্র হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিলেত থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফেরার পরই তাঁর প্রতিভার স্বরূপ আমরা দেখলাম, দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে।

শৈশবকালে কেউ কেউ যা খেতে চাইতেন, তাই পেতেন আবার কেউ কেউ অখাদ্যকে খাদ্য হিসেবে খেতে বাধ্য হতেন। কিন্তু এঁরা উভয়েই প্রত্যেকেই কিন্তু বড় হয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন কেবল মাত্র তাঁদের প্রতিভার গুণে। প্রথমজন চিত্রশিল্পী মুকুল দে (১৮৯৫-১৯৮৯)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য এই আন্তর্জাতিকখ্যাতি সম্পন্ন চিত্রশিল্পী এ বিষয়ে নিজে কি বলছেন শোনা যাক ঃ

> ''খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমি চিরকালই খুব পটু ছেলেবেলা থেকেই। খাওয়ার কথা ভাবতেও আমার ভাল লাগে। এখন শান্তিনিকেতনে ছোটো একটি বাটিতে এক মুঠো মুড়ি কিংবা দু-খানা পাতলা টোস্ট আর একপোয়া সুপ আমার বরাদ্দ। সেকালের খাওয়ার গল্প করলে অনেকের শুনেই আতঙ্কে বদহজম হবে, খাওয়া তো দূরের কথা। আর সেসব খাবার পাওয়া যাবেই বা কোথায়, আজকাল কি আর সেসব খাবার আছে না দেখতে পাওয়া যায়? ঘি খেতাম কত? মনে আছে, একটা বড়ো জামবাটিতে ঘি ঢেলে তার উপর গরম ভাত ঢেলে দিতেন মা, আমি ঘি থেকে ছেঁকে ছেঁকে তুলে ভাত খেতাম — ঠিক যাকে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া বলে!''

আর এরই সঙ্গে আমরা দেখে নিই বাংলা নাট্য জগতের তোলপাড় করা নাট্য প্রতিভা অবিসংবাদিত জনপ্রিয় অভিনেত্রী নটী বিনোদিনীর (১৮৬৩-১৯৪১) ছেলেবেলার একটি টুকরো স্মৃতিকথা। তাঁর মুখেই শোনা যাক ঃ

> ''আমার সেই সময়ের একটা কথা মনে পড়ে; আমার যখন বয়স বছর সাতেক তখন আমার মাতা কাহাদিগের কর্ম্ম বাড়ি গিয়া আমাদের জন্য কয়েকটা সন্দেশ চাহিয়া আনিয়া ছিলেন। অনুগ্রহের দান কিনা, তাহাতেই দশ পনের দিন তুলিয়া রাখিয়া, মায়া কাটাইয়া আমার মাতার হাতে দিয়াছিলেন; এখন হইলে সে সন্দেশ দেখিলে অবশ্য নাকে কাপড় উঠিত। আমার মাতা তাহা বাটীকে আনিয়া আমাদের তিনজনকে আনন্দের সহিত খাইতে দেন। পাছে সেই দুর্গন্ধ সংযুক্ত সন্দেশ শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এইজন্য অতি অল্প করিয়া খাইতে প্রায় অর্দ্ধঘন্টা হইয়াছিল। এই আমার সুখের বাল্যকালের ছবি।''

বোঝা যায় প্রতিভা কিন্তু গরীব বড়োলোক, দেশকাল-পাত্র মানে না, প্রতিভা থাকলে তার স্ফুরণ ঘটবেই।

আর একজনের বাল্যকালের কথা বলে এই নিবন্ধের এখানে ইতি টানবো। ইনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নিরুপণকারী সেযুগের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। আজকের দিনে আমরা স্কুল কলেজে র‍্যাগিং শুনতে পাই। রাধানাথের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় সে সময়েও উনবিংশ শতকের বিশের দশকে হিন্দু কলেজেও র‍্যাগিং হত আর তখন রাধানাথ ছিলেন ঐ কলেজের (আসলে বিদ্যালয়) নীচের শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর কথায় ঃ

> ''১৮২৪ খৃঃ অব্দে আমি হিন্দু কালেজের নবম ও সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হই। উচ্চশ্রেণিস্থ বালকেরা নিম্নশ্রেণিস্থ বালকগণের উপর অযথা ক্ষমতা চালাইতেন; ইহার কারণ এই যে তখন অল্প সংখ্যক শিক্ষক ছিলেন, উচ্চতম শ্রেণিস্থ বালকেরা নিম্নশ্রেণিস্থ বালকগণকে শিক্ষা দিতেন। উচ্চশ্রেণিস্থ বালকেরা শিক্ষকের স্থলাভিসিক্ত হইয়া, বালকস্বভাবসুলভ অভিলাষ, অনভিজ্ঞতা, অথবা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নিম্নশ্রেণিস্থ বালকগণকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেন; এবং প্রায় তাহারা কেহই তজ্জন্য শাস্তি পাইতেন না...''।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিভায় প্রতিভাত শৈশব

ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

প্রতিভা মানুষ নিয়ে জন্মায় নাকি জন্মে অর্জন করে অর্থাৎ সেই 'পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র' এ কূট পন্ডিতি তর্কে না গিয়ে বরং দেখা যাক পৃথিবীর ইতিহাসে কিছু বিস্ময়কর মানুষের প্রতিভা শৈশবেই কেমন বিকশিত হয়েছিল।

ফরাসী গণিতজ্ঞ ইভার্ষ্টি গ্যালো (১৮১১-১৮৩২) একেবারে শৈশবেই অ্যালজেব্রার গ্রুপ থিওরির মত গূঢ় তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন। গণিতের এই শাখাটি বর্তমানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অন্যতম অঙ্গ। স্ট্যানফোর্ড বিনেট এই দুই মনোবিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত আই কিউ পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেখা যেত হয়ত গ্যালো মাত্র দশ বছর বয়সেই আই.কিউ-এর সর্বোচ্চ সীমারেখা ছুঁয়ে ফেলেছিলেন।

আমেরিকার মেরিল্যান্ডের বাসিন্দা ১৬ বছরের জ্যাক আন্দ্রেকার খুব অল্প বয়সেই আবিষ্কার করেছিল এক রাসায়নিক যা ক্যানসার নির্ণয়ের সহায়ক। কাকার অগ্নাশয়ের ক্যানসারে মৃত্যু ছোট্ট জ্যাকের মনে গভীর ভাবে নাড়া দেওয়ার ফল ঐ আবিষ্কার কিন্তু ঐ আবিষ্কারের জন্য যে ল্যাবরেটরির পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার ছিল তা পেতে তাকে বিস্তর কাঠ খড় পোড়াতে হয়। আন্তর্জাতিক এক বিজ্ঞান মেলায় জ্যাক পুরস্কার পেয়েছিল ৭৫ হাজার পাউন্ডের একটি চেক।

আমেরিকারই ইন্ডিয়ানার বাসিন্দা জ্যাক অফ বার্নেট-এর আই কিউ লেভেল ছেলেবেলাতেই ছিল ১৭০-- ক্যালকুলাস, অ্যালজেব্রা বা ত্রিকোণামিতির যে কোন কঠিন অঙ্কের সমাধান তার কাছে ছিল জলভাতের মত। শিক্ষকরা পর্যন্ত এই বিস্ময় বালককে সমীহ করে চলতেন। একটু বড় হয়ে সে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উপর বিস্ময়কর কাজ করেছিল এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক মন্তব্য করেছিলেন যে তার কাজ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মত। অথচ ছোট থেকেই জ্যাক ছিল আটিজমে (Autism)আক্রান্ত।

পেনসিলভ্যানিয়ার ম্যারিয়ান বেচেল-এর বয়স এখন ১৮। এই বয়সেই সে আবিষ্কার করেছে ল্যান্ডমাইন্ড ডিটেক্টর বা বিস্ফোরক ধরার যন্ত্র। ২০১২ সালে ম্যারিয়ান তার এই কৃতিত্বের জন্য বিশ্বের দরবারে পুরস্কৃত হয়েছে।

টেক্সাসের শ্রী বোস (Shree Bose) মাত্র ১৮ বছর বয়সে তৈরী করেছে এমন একটা ওষুধ যা ক্যান্সার নিরোধক। হার্ভার্ডে মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে পাঠরতা এই ছাত্রী বর্তমানে Cisplatin নামে ক্যানসারের আর একটি ওষুধের উপর গবেষণা করছে। এই কাজটি করতেও তাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শ্রী নিশ্চিত সে ভবিষ্যতে সাফল্য পাবেই।

গ্রীসের ম্যাসিডোনিয়ার ১৪ বছরের মার্কো ক্যালাসান এই বয়সেই পৃথিবীবিখ্যাত কম্পিউটার এ্যানালিস্ট। ৬ বছর বয়সে তার প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখা যায়। ছোট থেকেই কম্পিউটারে গেম খেলায় তার কোন আগ্রহ ছিল না। ২ বছর বয়সেই সে ভালো লিখতে শেখে, ৪ বছরে ইংরেজী শিখে ফেলে এবং ৬ বছর বয়স থেকে কম্পিউটারে তার সীমাহীন দক্ষতা প্রকাশ পায়। ২০১০ সালে মার্কো Windows 7 এর উপর ৩০৫ পাতার একটি আস্ত বই লিখে ফেলেছিল যে বইটি সরকার বিনামূল্যে সব স্কুলে বিতরণ করে থাকে।

সঙ্গীতে বিস্ময়প্রতিভা ভারতের কুমার গর্ন্ধব মাত্র ১২ বছর বয়সে বিশ্বের তাবড় সঙ্গীতজ্ঞদের অবাক করেছিলেন তাঁর গানের মাধ্যমে। সেরকমই সেতারের বিস্ময় প্রতিভা চন্দ্রশেখর দেশমুখ মাত্র ৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং স্বয়ং রবিশঙ্কর এটুকু শিশুর বাজনা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে তাকে চাইল্ড প্রডিজি আখ্যা দিয়েছিলেন। কর্নাটকী সঙ্গীতের ম্যান্ডোলিন বাদক ইউ শ্রীনিবাস মাত্র ন'বছর বয়স থেকেই জাতীয় স্তরে বাজনায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন আর ওস্তাদ আল্লারাখার পুত্র তবলার প্রবাদ পুরুষ জাকির হোসেন মাত্র ১২ বছর বয়সেই তবলা বাজাতে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সুজাতা মোহন মাত্র ১০ বছর বয়সেই যেশুদাসের সঙ্গে গান গাইতে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। তখন তার নাম ছিল বেবি সুজাতা। ক্লাস সিক্স-এ পড়া অবস্থায় তার প্রথম গানের রেকর্ড বেরোয় এবং ১৮ বছর বয়সের আগেই ২০০০ অনুষ্ঠানে গান গেয়ে সে শ্রোতাদের মন জয় করেছিল।

শৈশব আছে শৈশবেই

প্রদীপ ভট্টাচার্য

'শিশু ভোলানাথ'। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সরল, হাবাগোবা, নিষ্পাপ এক ফুটফুটে শিশুর ছবিই আমাদের মনে ভেসে ওঠে। ভোলানাথ শিবের মতই সে সংসার তথা জগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, ধূলিধুসরিত তার অঙ্গ, নিজের বেশভূষা ও পারিপাট্যের প্রতি তার যেন কোন দৃকপাতই নেই। সে আপন খেয়ালে আপনি মগ্ন। একজন গড়পড়তা শিশুর এই রূপের জন্যই তাকে ভোলেবাবার সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে এভাবেই বিশেষিত করা হয়েছে — 'শিশু ভোলানাথ'।

পাঠক, আজকের শিশুর কথা স্মরণ করে দেখুন তো, কোথাও তার মধ্যে এই শিশু ভোলানাথের ছবিটা পান কিনা! না, আজকের শৈশবে কোথাও উদাসীনতার স্থান নেই। শৈশব থেকেই সে অত্যন্ত হিসাবী। নিজের ভাগে কোথাও এতটুকু ফাঁক পড়ুক সেটা সে একেবারেই বরদাস্ত করবে না। সে শৈশব থেকেই সবকিছু বুঝে নিতে অভ্যস্ত। তার এহেন আচরণে হতাশ হয়ে বা বিরক্ত হয়ে আমরা অর্থাৎ বড়রা আক্ষেপের সঙ্গে বলাবলি করি - 'আজকের দিনে শৈশব হারিয়ে গিয়েছে। সে ছিল আমাদের কালে, যখন ..... ইত্যাদি'।

অথচ পাঠক, মজার কথা দেখুন, শিশুর শৈশব কিন্তু কোথাও হারায়নি, তার শৈশবকে কেড়ে নিয়েছি আমরা বড়রাই, যারা ঘরে বাইরে তার চারপাশে ঘিরে রয়েছি। একজন শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্রই নানারকম হিসাবের প্যাকেজ আমরা বানিয়ে ফেলি, কখনও কখনও যার প্রথমটা হলো তার জন্ম নেবার দিন কবে হবে!

মাতৃত্বের সম্ভাবনা নিয়ে কোনও ভাবী মা যখন প্রথম ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের দ্বারস্থ হন, সেই ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ তাঁকে পরীক্ষা করে, হিসাব কষে একটি দিন বলে দেন, সে দিনটির আশেপাশে শিশুটির ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা থাকে। কথায় বলে 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে'। একেবারে বিশেষজ্ঞ নির্দিষ্ট দিনেই যে শিশুটির জন্ম হবে, তার স্থিরতা নেই। কিন্তু ঘটনা বিরল নয়, বরং আজকাল তার প্রকোপ অনেক বেড়ে গিয়েছে - সেই শিশুটির ভাবী বাব-মা বাড়ী ফিরে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টিয়ে দেখে নেন, ওই বিশেষ দিনটির আশেপাশে কোন 'ভালো' দিন আছে কিনা! যেমন ধরুণ, ডাক্তারবাবু কথিত দিনটির কয়েকদিন আগে পরে পড়েছে জন্মাষ্টমী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ব্যস! আপনি সেই দম্পতি বা তাঁর নিকট পরিজন ডাক্তারবাবুর হাতেপায়ে ধরতে থাকেন, যাতে ওই বিশেষ দিনটিতে তিনি সিজারিয়ান সেকশন-এর মাধ্যমে ওই শিশুটিকে ধরাধামে অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেন। তাতে ওই শিশু শ্রীকৃষ্ণের মতো অসীম গুণবাণ হয়ে উঠবে কিনা জানা না থাকলেও একটি পূণ্যতিথিতে শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে দিয়ে এক মহাপুরুষের জন্মের সঙ্গে তার জন্মকে গেঁথে ফেলে এক পরম সন্তুষ্টি লাভ করেন তার বাবা-মা বা নিকট আত্মীয়বর্গ। তাছাড়া পূণ্যদিনে জন্মের পূণ্যার্জনের সম্ভাবনা তো থাকলই!

এই হলো শুরু। সারা শৈশব কৈশোর যৌবন জুড়ে এহেন আরও কতরকম হিসাবী পদক্ষেপের সম্মুখীন হতে হবে তার কোন হিসাব নেই। মহাভারতে পড়ি, সুভদ্রার গর্ভস্থ অভিমন্যু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই গর্ভে থাকাকালীন চক্রব্যুহ ভেদ করে ভিতরে ঢোকার কৌশল আয়ত্ব করেছিলো। মায়ের সঙ্গে নাড়ীর সূত্রে বাঁধা আজকের গর্ভস্থ শিশু কি গর্ভে থাকার সময়ই 'হিসাবী' হবার মন্ত্র রপ্ত করে ফেলে? জানি না। কিন্তু হাঁটি হাঁটি পা পা শিশু আড়াই বছর বয়সে পা দেওয়া মাত্রই 'খেলার ছলে শেখানো'র অজুহাতে তথাকথিত প্রিপারেটরি স্কুলে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, তা যদি না করা হয়, তবে তার দু'তিন বছর পর যখন শিশুটি তার 'আসল' শিক্ষা শুরু করবে, প্রিপারেটরি স্কুলের শিক্ষার তালিম না নেওয়ার কারণে তাকে অন্যান্যদের থেকে পিছিয়ে পড়তে হবে, শহরের 'নামজাদা' স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ হারাতে হবে।

পাঠক, রুষ্ট হবেন না। আমি কিন্তু এই ব্যবস্থা বা সিস্টেমের ভালোমন্দ বা ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে কোন কথা বলছি না। আমি বলছি, আমাদের মধ্যেকার ভন্ডামির কথা। আমরা বড়রা একদম প্রথম থেকেই ইংরাজীতে যাকে বলে 'টডলার' সেই বয়স থেকেই শিশুকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি, ইদুরদৌড়ে সামিল হবার ট্র্যাকে। 'যা বেটা, দৌড় লাগা, হারা দো সবকো, সাবাশ বেটা, থোড়া ফাস্ট, থোড়া ফাস্ট।' সত্যিই তো, এই ভয়ঙ্কর সময়ে, এই কন্টকবিস্তীর্ণ দুনিয়ায়, এই কঠোর প্রতিযোগীতার জগতে - এই দৌড়ে একজন শিশুকে শৈশব থেকেই সামিল করিয়ে দিতে না পারলে, শিশুটি

যখন বড় হবে, যখন আমরা থাকবো না তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে, তখন তো ওকে না খেয়ে মরতে হবে। হাহাকার করতে হবে একটু থাকার জন্যও! তাহলে কি অন্যায় করেছি আমরা? তার শুভাকাঙ্খী হিসাবে এটুকু করব না?

অবশ্যই করব। কিন্তু, তাহলে সভায় সমিতিতে, সেমিনারে, টিভির পর্দায়, বেতারের কথিকায় কেন চুকচুক করে আক্ষেপ করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গাইব — 'আহা রে ! এদের শিশুবেলা বলে কিছু নেই। সে ছিল আমাদের সময়ে, যখন .....' ইত্যাদি! এই লেকচারবাজির অর্থ কি!

থাক এই ইঁদুড়দৌড়ের কথা। বোঝা যায় এ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় আপাততঃ নেই। 'পৃথিবী বদলে গেছে, তাকে কি নতুন লাগে' — সে তো বড়দের কাছে! আজকের শিশু তো আজকের জীবনেই অভ্যস্থ। সে তো আগেকার শৈশবের সঙ্গে তার শৈশবের তুলনা করতে পারছে না! ধরুন, আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও একটি বাচ্ছা ছেলে স্কুলে যেতে পারত একা বা তার সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে। এই নিবন্ধ লেখক ক্লাস ওয়ান থেকেই (তখন সেটাই ছিল স্কুলে যাবার সূচনা) পাশের বাড়ীর এক ক্লাস উঁচুতে পড়া বন্ধুর সঙ্গে প্রতিদিন দেড় কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে যাওয়া আসা করতে অভ্যস্ত ছিল। যে দিনগুলিতে তার সেই সঙ্গী স্কুলে যেতে পারত না, সেদিন তাকে একাই যাওয়া আসা করতে হত। তখন এটাই ছিল রীতি। আজকের দুনিয়ায় কোন পিতামাতার পক্ষেই ওইটুকু শিশুকে একা বা তার সমবয়সী কোন শিশুর সঙ্গে স্কুলে পাঠানো সম্ভব নয়, তার নিরাপত্তার কারণেই। কাজেই শৈশবের সে স্বাধীনতা আজকের প্রাপ্তবয়স্করা এককালে ভোগ করেছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা, শৈশবের ঠিক সেই আনন্দ আজকের শিশু উপভোগ করবে না, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যেও আজ যে সব শিশু পুলকার বা স্কুলবাসে চেপে অনেকের সঙ্গে স্কুলে যাতায়াত করে, তারা নিশ্চয় তাদের মতো করেই শৈশবের মজা খুঁজে পায়।

সত্যি কথা বলতে কি, আজ যারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের শৈশবের সঙ্গে আজকের শৈশবের কোন তুলনা করাই উচিত নয়। তিরিশ বা চল্লিশ বছর আগেকার দিনকালের সঙ্গে আজকের দিনকালের অনেক অ-নে-ক তফাৎ। প্রতি পদে নানাভাবে বিপদ ওত পেতে আছে আজকের পথে ঘাটে। এখন দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং মূল্যবোধবর্জিত মানুষের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক বেশী। শিশু যদি আজ 'ভোলানাথ' হয়ে থাকে, তবে আখেরে তার বিপদ অনেক বেশী। প্রতিযোগীতাই সব নয়। আজকে যে বাচ্ছা ছেলে বা মেয়েটির উপস্থিত বুদ্ধি এবং দুনিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বেশী, সে তত বেশী নিরাপদ।

আজকের শিশু আজকের মতো করেই বড় হয়ে উঠুক। সত্যিই, আজকের শৈশবের জন্য নেই ভোরের শিউলিফুল, চিলেকোঠার দুপুর, বিকালের 'আইসপাইশ' বা দাড়িয়াবান্দা খেলা। কিন্তু তার জন্যও তো আছে কম্পিউটারে নানারকম ভিডিও গেমস্, টিভির মজাদার কার্টুন বা টি-২০ র উত্তেজনা, স্কুল থেকে ফিরে সাঁতার, ক্যারাটে বা বন্ধুদের সঙ্গে যোগাসনের ক্লাস। আজকের শিশু আজকের উপকরণেই মশগুল। ক্ষতি কি? তার আনন্দ তো তার কাছে। ঠাকুমার ঝুলি নাই থাক, সে যদি হ্যারিপটারে আনন্দ পায় তাতে অসুবিধা কোথায়? আর তার হাতে 'ঠাকুমার ঝুলি' বা 'দাদামশায়ের থলে' তুলে দেবার দায়িত্ব কার?

শিশু তার শৈশব উপভোগ করে তার মতো করেই। সে শৈশবে ঘুণ ধরাই আমরা বড়রাই, আমাদের কৃতকর্মের জন্য তাকে ঘুষ দিতে গিয়ে, আমাদের নিজেদের স্বার্থপূরণের জন্য তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষার বীজ রোপণ করে। আগে ছিলো একান্নবর্তী পরিবার। বাব-মা ব্যতিরেকেও দাদু-ঠাকুমা, কাকা-জ্যাঠা, খুড়তুতো-জ্যাঠাতুতো ভাইবোনদের সান্নিধ্যে শিশুর দিন দিব্যি কাটত। এখন নিউক্লিয়ার পরিবারে বহুক্ষেত্রেই বাবা- মা দু'জনেই কর্মসূত্রে সারাদিন বাইরে কাটান। শিশু স্কুল থেকে ফিরে বেতনভুক কোন 'দিদি' বা 'মাসী'র সঙ্গে কিছুটা সময় কাটায় বা বৈকালিক রুটিনে সামিল হয়। কিন্তু বাবা-মা বাড়ী ফিরে আসার পর বা ছুটির দিনে যদি তাকে যথেষ্ঠ পরিমাণে সঙ্গ না দেয়, তাহলে তো তার মধ্যে একটা বিপন্নতা, সমাজ সংসার সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষ ভেতরে ভেতরে গড়ে উঠবেই। বাবা-মাও তাকে যথেষ্ট সময় দিতে না পারার 'অপরাধ বোধে' প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বা তাকে 'ঘুষ' দিয়ে খুশি রাখার অভিপ্রায়ে দামী খেলনা থেকে শুরু করে লোভনীয় খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক আশাক তার হাতে তুলে দেয়। এই ভাবেই তার মধ্যে কৃত্রিম চাহিদার বীজ রোপিত হয়। 'কৃত্রিম', কারণ এটা তো তার সত্যকার চাহিদা নয়। ফলে অল্পসময়েই তার কাছে সেই বস্তুর আদর ফুরোয় এবং পাবার অভ্যাসে নতুন আর কিছুর চাহিদা ঘনায়। কিন্তু তার আসল চাহিদা তো কাছের লোকের সান্নিধ্য, যা না পেয়ে সে ভিতরে ভিতরে অভিমানী বা হিংস্র হয়ে ওঠে, যার চিত্র আমরা প্রায়শঃই আজকাল সংবাদপত্রে পেয়ে থাকি।

আবার বলব, শৈশব কোথাও হারায়নি। আমরা বড়রা যারা শিশুদেরকে ঘিরে থাকি, তারা যদি শিশু মনস্তত্বকে বুঝে, তাদের সত্যিকারের চাহিদা কি সে সমন্ধে সচেতন হয়ে তাদের একটু সঙ্গ দিই, ইঁদুর দৌড়ে তাদের সামিল করার পাশাপাশি, তাদের সঙ্গে যাকে বলে 'কোয়ালিটি টাইম' কাটাই, তাদের শৈশবকে এযুগের মতো করেই তাদের হাতে গুঁজে দিই - তাতেই তারা উছল হয়ে ওঠে, রঙীন মাছেদের মতো ছোটাছুটি করে, প্রজাপতির মতো, ঘাস ফড়িং এর মতো উড়ে বেড়াতে পরে, একমুঠো ফুল হয়ে আমাদের জীবনও আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে।

সেই শৈশব এখন শব

পল্টু ভট্টাচার্য

''আট কড়াই বাট কড়াই ছেলে আছে ভাল .....'' বলে বেতালা বেসুরো একদল শিশু একটা কুলোকে পেটাচ্ছে। কাপড়ে জড়ানো নবজাতক মা'র কোলে আঁতুড়ঘর থেকে তার পরিচিত জগতে পা রাখল। তারপর প্রদীপের আলোয় সেই কুলোকে পুড়িয়ে আটকড়াই চিবোতে চিবোতে শিশুদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল নবজাতককে ছুঁয়ে দেখার জন্যে। দিন যায়, শিশু হাত পা ছোঁড়ে তন্ময় দৃষ্টিতে আর ঠাকুমা বা দিদিমা মুখের সামনে ছড়া কাটে।

'হাত ঘুরলে নাড়ু দেব।
নইলে নাড়ু কোথায় পাব?'

শিশুটি হাত পা ছুঁড়ে খলবলিয়ে ওঠে। সন্ধ্যাকালে ঠাকুমা বা দিদিমার কোলে চড়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কানে আসে

'আয় আয় চাঁদ মামা
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।'

গম্ভীর হয়ে বাহ্যিক জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়। আস্তে আস্তে বয়েস বাড়ে, হামা দিতে দিতে শোনে দাদুর কণ্ঠস্বর

'রবি মামা দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ।'

— হায় রে চিরপরিচিত শৈশব। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে বলতে হয় 'হায়রে বাঙালী তোমার শৈশব গিয়াছে'। এযুগে শিশুরা নার্সিং হোম থেকে বাড়ি এসে হ্যাগিস, প্যাম্পার, বেবি শ্যাম্পু ও ওয়াইপস আর ল্যাক্টোজেন, সতেরো রকমের সেরেল্যাক খেতে খেতে কখন যে পুলকারে রং বাহারী স্কুলে পৌঁছে যায় তা টের পাওয়া যায় না। নেই সাবু, বাটি, দুধের গন্ধ, নেই স্লেট পেন্সিলের ধুলো। বাড়ির বা পাড়ার পাঁচজনের কোলে বেড়ে ওঠা তো দুরস্ত, আর পাঁচটা শিশুর সঙ্গে বেড়ে উঠে নিজস্ব মেধার বিকাশ বা মস্তিষ্কের প্রত্যুৎপন্নতার বৃদ্ধির অবকাশ নেই। গেঁয়ো বাংলায় বলা যায় একালের শিশুরা 'একাল সেঁড়ে'। শিশুকাল থেকেই নিজেরটা বুঝতে শেখে, ভালবাসা, বন্ধুত্ব বা হৃদয় বিনিময় বছরে শুধু একদিন। সে দিন রঙিন টুপি পরে মোমবাতি নিভিয়ে বাঁশি বাজাবে আর হোটেলের খাবার খেতে খেতে বন্ধুদের কিছু উপহার দিয়ে জানাবে আজ আমার জন্মদিন। অথচ এমন তো ছিল না। আগেকার দিনে শিশুরা শৈশবকে স্বাগত জানাতো নানান খেলা আর খাওয়ার মধ্যে দিয়ে। কোথায় গেল চোর চোর , হুস হুস, আইস-বাইস, কুমীর ডাঙা, বুড়ী বসন্ত খেলা। কি উদ্ভাবনী শক্তি, কমবয়সী বা কমজোরি বন্ধুকে খেলতে নিতে হবে। তাই তাকে এলেবেলে বা এম এ বিটি নাম দিয়ে দলে নেওয়া হলো। হুস হুস খেলতে খেলতে কতরকম গাছ আর ফল চেনার অভিজ্ঞতা, এখন তো মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে স্কুল বাসে ইকোগার্ডেন দেখতে যেতে হয়। স্কুল থেকে ফিরে কিছু মুখে দিয়েই বাড়ির উঠোনে বা মাঠে নানান খেলা খেলতে খেলতে বিকেল কাটানো। কারো শরীর খারাপ হলে খেলা বন্ধ করে তার চারপাশে থাকা। এভাবেই বিকেল কাটত। শরীর ও মন তাজা হতো। কিন্তু বাড়ির হুকুমে ল্যাম্পপোষ্টে আলো জ্বললেই বাড়ি ফেরা। হাত পা ধুয়ে সামান্য হাতে গড়া রুটি দুধ কিংবা ফেলে দেওয়া আনাজ দিয়ে রাঁধা পাঁচতরকারি খেয়ে পড়তে বসা। এতো নুডল, সুপ, রোল, কেকের বহর ছিল না। রাত ন'টা কি দশটার মধ্যে সাধারণ ভাত, ডাল, রুটি, মাছ খেয়ে শুয়ে পড়া। রাত জাগা নৈব নৈব চ। ভোরে উঠে চিৎকার করে পড়লে সব পড়া মুখস্থ হয়। বড়দের বিধান মানতে হবে। পায়ে কিংবা সাইকেলে একা নয়, ভাই বোন পড়শীদের সঙ্গে স্কুল যাওয়া এবং ফেরা। বাবা ও মা কেউ পৌঁছে দেবে না। শৈশব মন ঘনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা, শিষ্টাচার, সংযম, মানুষের কর্তব্য দায়িত্ব এবং পরিবারের ঐতিহ্য বহন প্রভৃতির বীজতলা। সামগ্রিক পরিবেশটা সুন্দর না হলে একটা মানুষ নিজের পায়ে সৎ ভাবে দাঁড়াবে কি করে? স্বামীজী বলেছেন মানুষ হয়ে যখন এসেছ তখন দাগ কেটে যাও। সেই দাগ কাটার প্রস্তুতি তো শৈশবকালই নির্দেশ করে। কিন্তু যুগের হাওয়ায় হীনমন্যতা বা আত্মকেন্দ্রিকতা শৈশবকে অঙ্কুরে বিনাশ করছে। একটা শিশু আজ যেন পণ্য। অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আজকের শিশু এক বিচিত্র গতির ফসল। লাগাম ছাড়া জীবনে সে শেখে না থামতে বা একটু ভাবতে। নার্সিং হোম, আয়া, ক্রেশ, বেবিফুড, ডাক্তার, হ্যাপি বার্থ ডে. আড়াই বছরে প্রেপ স্কুল, সব যেন তাকে বলে এগিয়ে চলো। পাড়ার অভদ্র ইতরদের সঙ্গে খেলার প্রয়োজন নেই। কার্টুন দেখো, কম্পিউটারে গেম খেলো। চারিদিক শূণ্য। একটা বিরাট শূণ্যতা, বাবা ট্যুরে, মা অফিসে, দাদু, দিদা, ঠাকুমা ঠাকুর্দাময় বাড়ির আর পাঁচজন কাছে নেই। তাই সেই

শৈশব থেকেই তাকে একা চলতে হয়। গড়ে ওঠে না কোন শিশু সুলভ চাপল্য। ঘরের চারিদিকে দেওয়াল যেন তার শৈশবকে সিন্দুক বন্দী করে রাখে। প্রতিনিয়ত তাকে লড়াই করতে হয় বিচিত্র শাসনের সঙ্গে। খাঁচাবন্দী পাখি যেন শৈশব কাটাচ্ছে। অবচেতনে রাগ, দুঃখ কষ্ট দেখা দেয় কিন্তু বিধির অমোঘ বিধানে সে তো কনজিওমারিস্ট ওয়াল্ডের সম্পদ। তার শৈশব থাকবে কেন? তাকে তো চারপাশের আর পাঁচজনের মধ্যে সেরা হতে হবে। মায়া মমতা, সমবেদনা, স্নেহস্পর্শ কিছুই তার কপালে জুটবে না। তাকে জানতেই হবে যে শৈশব নিছকই এক নীরস শব্দ। বাবা মা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তাকে বড় করে তুলছেন শুধুই পৃথিবীর শীর্ষে ওঠার তাগিদে। যোগ্যতা থাক বা না থাক এই প্রতিযোগিতায় তাকে অংশ নিতে হবে। কারণ সে এক পণ্য। তার পিছনে ব্যয়িত অর্থ যেন দশগুণ হয়ে ফিরে আসে পরিবারে। তাই তো দেখা যায় সে যেমন শৈশবে বিচ্ছিন্ন একা ঠিক তেমনিই জীবনের শেষপ্রান্তে একেবারে একা। এই দর্শনই বলে সেই শৈশব এখন শব। তাই কবির ভাষায় বলি 'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কতো আর .....'।

ছাত্রের শাস্তি

তীর্থপ্রতিম দাশ
(বেতারবিজ্ঞান ও বৈদ্যুতিক বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

এই লেখাটি চিঠি আকারে প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায় ১.৮.২০০০ তারিখে।

পত্রিকার খবরে জনৈক শিক্ষকের ছাত্র নিপীড়নের খবর পড়লাম। এই ঘটনা পাঠ করে আজ থেকে প্রায় দশ-এগারো বছর আগের স্মৃতি উঁকি দিয়ে গেল। তখন আমি দক্ষিণ কলকাতার সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের শ্রেণীশিক্ষক ছিলেন একজন ফাদার, যিনি অভিনব শাস্তি ও সংশোধন পন্থার সূচনা করেছিলেন আমাদের শ্রেণীতে। ফাদার আমাদের ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সেই অভিনবত্বের কিছু স্মৃতি আজ তুলে ধরছি।

আমাদের শ্রেণীতে মোট চারসারি বসবার আসন ছিল। ঐ চার সারির ছাত্রদের তিনি চারটি হাউসের নাম দিয়েছিলেন — ব্লু, গ্রিন, রেড, ইয়েলো। প্রতিটি হাউসের সদস্যদের শিষ্টাচার, কোন প্রশংসার কাজ তার হাউসের নম্বর বৃদ্ধি করত। তেমনিই কোনও সারির সদস্য শ্রেণীকক্ষ অপরিস্কার করলে বা কোনও অশিষ্ট আচরণ করলে সেই হাউসের নম্বর কাটা যেত। ফলে সম্পূর্ণ শ্রেণীকক্ষে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা বিরাজ করত যা কখনই আমাদের কাছে আরোপিত বলে মনে হয়নি। বরং জীবনপথে চলবার সময় সেই শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের শিক্ষা সহজাত রূপে প্রকাশিত হত।

ফাদারের শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল গঠনমূলক। কোন অপরাধে কেউ অপরাধী হলে তার নাম তোলা হত একটি ছাত্রের খাতায়, তার নাম ছিল ডিফল্টার বুক। সেই অপরাধীর শাস্তি ছিল শেলি, বায়রন বা কিটসের কোনও কবিতা মুখস্থ করা। নির্দিষ্ট দিনে ছুটির পরে বা মধ্যাহ্ন বিরতির সময়ে ফাদারের কক্ষে উপস্থিত হয়ে মুখস্থ বলতে হত। ফলে ইংরেজি সাহিত্যের দু'একটি মণিমাণিক্যের সন্ধান পাওয়া যেত। অপরাধের তালিকায় ছিল কিছু শিষ্টাচার ভঙ্গের ব্যাপারও। যেমন হাই তোলার সময় মুখে হাত চাপা না দেওয়া, থ্যাঙ্ক ইউ এর উত্তরে ওয়েলকান না বলা প্রভৃতি। অন্য কোনও গুরুতর অপরাধের কথা (যা ওই বয়সে সম্ভব) আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল।

ছাত্রদের মনের কথা তাদের আশা আশঙ্কা জানাবার অভিপ্রায় তিনি কোয়েশ্চন বক্স নামে একটি বাক্সের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সবাই মনের কথা লিখে সেই বাক্সে জমা দিতাম। প্রতিপক্ষে একবার অথবা মাসে একবার সেই বাক্স খুলে শিক্ষক ও ছাত্ররা পরস্পরের মনের কাছাকাছি আসতেন। বয়ঃসন্ধির সেই দিনগুলির প্রাক্কালে ফাদার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অসুন্দর হস্তাক্ষর সুন্দর করবার জন্য তিনি যে শাস্তি দিতেন, তাও সুন্দর। অভিযুক্তকে নিজ ভাষায় কোনও বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে আনতে হত। বলা বাহুল্য, সেই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এবং তার হস্তাক্ষর — দুইই ফাদারের প্রশংসাধন্য হত। এই ভাবে কল্পনাশক্তি তার ডানা মেলে দিত, নিজ ভাষায় লিখবার ক্ষমতা জাগ্রত হত, সনাতনী সাহিত্যের রসগ্রাহী সংস্কৃতিমনস্ক ছাত্র তৈরী হত। সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ফাদার দীপক গোমেজ আজও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে শিক্ষকতা করে চলেছেন।

ছেলে ভুলানো (?) — ছড়া

ডঃ সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

ছড়ায় বালকের মন মেতে ওঠে, চোখের সামনে নানা বর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি সে দেখতে পায় - এর কারণ দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা। রবীন্দ্রনাথের মতে শিশুর কাছে ছড়া একারণেই আকর্ষণীয়। 'ছিন্নপত্রে' কবি লিখেছেন, ছড়ার রাজ্যে আইনকানুন নেই, মেঘ রাজ্যের মতো। কিন্তু এই কবিই অন্য একজায়গায় লিখছেন - 'এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসি কান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয় বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।' বোঝা যায় কবি মূলত ছেলেভুলানো ছড়াগুলিকে দু'ভাবে দেখার কথা বলেছেন — একটা শিশুর দেখা; অন্যটি বড়দের দেখা। ছন্দের দোলা, উদ্ভটত্ব, বৈচিত্রপূর্ণ চিত্র নির্মাণ এবংবিধ নানা বিষয় শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে। বড়দের কাছে যে এগুলির মূল্য নেই এমন নয় — তবে এর বাইরে এমন অনেক দিক আছে যা ছড়া চর্চাকারীদের নানা তথ্যের উৎসমুখ হিসেবে কাজ করে। যে জন্য ছড়ার দর্পণে বাংলার মুখ দেখতে চেয়েছেন কেউ কেউ। 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র প্রেক্ষিতে এমনই কতকগুলি বিষয় বোঝার চেষ্টা করবো।

'ছেলেভুলানো ছড়া' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ; যেখানে প্রবন্ধের পাশাপাশি ৮১টি সংগৃহীত ছড়া সংযুক্ত করেছেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রকাশ পায়; যা কবির 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধেরই পরিমার্জিত রূপ। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থধৃত হয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'লোকসাহিত্যে'। এখানে দুটি প্রবন্ধ ছিল; ছেলেভুলানো ছড়া (১৩০১ বঃ), ছেলেভুলানো ছড়া ২ (১৩০২ বঃ) সংগৃহীত ৮১টি ছড়া স্থান পেয়েছে ছেলেভুলানো ছড়া ২-এর শেষে। 'ছেলেভুলানো ছড়া' বিষয়ক একাধিক আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। কিছু আলোচনা রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের সম্পাদিত সংস্করণের ভূমিক স্বরূপ; আর কিছু আলোচনা প্রবন্ধ-নিবন্ধের আকারে। এই সব লেখাগুলির মধ্যে শিশুর এবং সমাজের বিভিন্ন দিক কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখানোর প্রয়াস করেছেন নিবন্ধকাররা। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে যেন আমাদের মায়ের চোখ দিয়ে দেখা! রবীন্দ্রনাথও মানতেন ছড়াগুলি মেয়েদের সৃষ্টি। যেজন্য প্রথমে 'মেয়েলি ছড়া' শিরোনামেই এগুলিকে প্রথমে প্রকাশ করেন তিনি। এখন প্রশ্ন হয় মেয়েদের চোখ দিয়ে বা মায়ের চোখ দিয়ে এমন কিছু বিষয় আমরা কী পাই না যা আমাদের সমাজের কিছু অন্তর্গঠনিক চরিত্রকে প্রকাশ করে।

প্রাথমিক ভাবে মনে হয়েছে এই ছড়াগুলির মধ্যে লিঙ্গগত পক্ষপাত রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিত সমাজ কাঠামোয় শিশু বালকটিকে নিয়ে যত ছড়া বালিকা সে তুলনায় কম উপস্থিত। আবার বালক বালিকা উভয়ে উপস্থিত থাকলেও তাদের ভিন্ন জগতের ছবিটি লিঙ্গ পার্থক্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এবং এই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত। ২০০৬ সালে 'অফবিট' থেকে অতিক্ষীণ কলেবর একটি ছড়া সংগ্রহ প্রকাশিত হয় — 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। এখানে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে থেকে ২২ টি ছড়াকে স্থান দেওয়া হয়। ভূমিকা বা ঐ জাতীয় কিছু না থাকলেও একটা অনুমান করা যায়, জনপ্রিয় তথাপি মূল্যবান কিছু ছড়া নামমাত্র মূল্যে সহজলভ্য আকারে শিশুদের হাতে তুলে দেবার অভিপ্রায়ে এ ধরনের একটি সংকলন। এখানে খোকাকে নিয়ে যা ছড়া রয়েছে খুকুকে নিয়ে তার অর্ধেক। এর তিনটি কারণ থাকতে পারে — এক, খোকা অপেক্ষা খুকুর ছড়া কম।

দুই, খোকা-খুকু অত শ্রেণিবিভাগ করে ছড়া বাছা হয়নি। যেগুলি ভালো লেগেছে বা প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে হয়েছে সেগুলিই নিয়েছেন সংকলকরা।

তিন, সচেতন ভাবে এটা করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এই তিনটি ক্ষেত্র থেকেই বুঝতে পারা যায় - সমস্ত নির্মাণটির ভিতর একধরনের লিঙ্গ পক্ষপাত কাজ করছে। এই পক্ষপাত সচেতন ভাবেও থাকতে পারে, অবচেতনার মধ্যে এটির থাকা অসম্ভব নয়। এধরনের ছাড়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে —

১. 'খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কূলে। .....'
২. 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো .....'
৩. 'ওরে ভোঁদর, ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।'
৪. 'খোকা এল বেড়িয়ে, দুধ দাও গো পুড়িয়ে ....'

খোকা-খুকির তুলনা থেকে উভয়ের বেড়ে ওঠার ধারণাটি আন্দাজ করা যায়। যাকে বলে সামাজিকীকরণ তার একটা প্রাথমিক পর্ব এই শৈশবকাল। এখানে দেখা যাচ্ছে, খোকা (ক) মাছ ধরতে যায়, (খ) গৌড়-এ গিয়ে সোনার ময়ূর আনতে চায় (গ) খোকা বেড়িয়ে এলে গরম দুধের বাটি এগিয়ে দেওয়া হয় (ঘ) যে পাঁচশো টাকার মলমলি থান আর সোনার চাদর গায়ে দিয়ে পায়ে লাল জুতো পরে বেড়াতে যায়, ইত্যাদি। আবার গরু চরানোর দায়িত্বেও তাকে দেখা যায় —

মারি নাইকো ধরি নাইকো বলি নাইকো দূর।
সবে মাত্র বলেছি গোপাল, চরাও গো বাছুর।

আরেক জায়গায় আছে -

খোকা যাবে মোষ চরাতে খেয়ে যাবে কী

ছড়ার মধ্যে শিশু শ্রমের ছবি ধরা পড়ছে। গরু বাছুর চরানোর কাজে নিয়োজিত হয় গোপাল বা খোকা। যদিও সমাজ যে একে খুব গর্হিত কাজ বলে দেখছে এমনটা মনে হয় না। কেননা এনিয়ে তেমন কোন কঠিন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, যা থেকে বোঝা যায় যে সমাজ একে একেবারেই অনুমোদন করছে না। বরং ছড়ায় আছে খোকা যখন কাঁদছে তখন তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলা হয় যে তাকে কেবলমাত্র বাছুর চরাতে বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা যায় যে এটি কান্নার মতো কোন বিষয়ই হতে পারে না। তাহলে বলতে হয় শিশু শ্রম বলতে তার গন্ডী বা মাত্রা কী হবে এপ্রসঙ্গে সচেতন জিজ্ঞাসা সমাজ ভেদে ভিন্ন হয়ে যায়।

এই ভিন্নতার একটি বড় কারণ শিশুর পরিসরে বড়দের অন্যভাবে বললে সমাজের ঢুকে পড়া। তাই চিরন্তন শিশুর বিশ্বজনীন মনোগত ঐক্য সেখানে ক্ষুন্ন হয়। অবনীন্দ্রনাথ যাকে মায়ের চোখ দিয়ে দেখা বলছেন সেই মা তার ভাব ও ভাবনার বহুবিধ উপাদানকে ছন্দের রথে চড়িয়ে দেন। এবং এই জন্যই ছোটদের ছড়ায় বিবাহের প্রসঙ্গ এত বেশী এসেছে।

জীবনের — ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রে — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সম্ভবত বিবাহ। ব্যক্তি মানুষের জৈবিক পরিচয় যেমন এর মধ্য দিয়ে স্থায়ী হয়ে যায় — তেমনি সমাজের স্থিতিশীলতা সুষ্ঠ বিবাহ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেখলে, বিবাহ কোন পরিবারে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ঘটনা। এর মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে বিচ্ছেদ ও মিলন সংঘটিত হয়। এই দুইটি ঘটনাই গতির অন্যতম প্রধান শর্ত। কাদের মধ্যে বিবাহ সম্ভব; কি আচারে বিবাহ হবে এসবই সমাজের অনুশাসন মেনে করতে হয়। যে অনুশাসন লঙঘন হলে সমাজ ব্যবস্থা টলোমলো হতে পারে। এর জৈবিক গুরুত্বও যে অসীম তাও সমাজ বুঝেছিল। তাই নানা নিয়ম কানুনে বিবাহকে বেঁধে রেখেছে সমাজ। বর্ণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন আশ্রমের মধ্যে গার্হ্যস্থকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা এই আশ্রমটি অন্য সকল আশ্রমকে ধরে রাখে। সকল পরিবারেই বাবা মা চায় তার সন্তান যেন সঠিক বিবাহের মধ্যে দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। মায়ের মনের এই সতর্ক ভাবনাই ছড়ায় প্রকাশ পায়। শিশুর অবচেতনায় চারিয়ে যায় সমাজের অনুশাসন।

আমার দাবী

মালতী দাস

শৈশব কথাটা ভাই দারুণ মিষ্টি
শৈশব ভবিষ্যতে হয়ে যায় হিস্ট্রি
সকলের শৈশব হয় নাকো এক
নেই কোন মিথ্যে দ্যাখ ভেবে দ্যাখ।

শৈশব কারো কাটে ভাল আর মন্দে
কারো কাটে খুব সুখে কারো নিরানন্দে।
তবু বলি শৈশব ভালো ছিল আগে
শৈশবের স্বাধীনতা ছিল ভাই ভাগে।
আজ শৈশব বন্দি নানা কাজ পাঠে
করে নাকো খেলাধূলা, যায় নাকো মাঠে।
ঘড়ি ধরে কাজ করে, শ্রমিকের ন্যায়
বাবা মা খুশি হয়ে, গিফট্ কিছু দেয়।

শিশু বড় যায় হয়ে, উঠে ধাপে ধাপে
বোঝে নাকো কেউ তার মন থাকে চাপে।
শিশুদের শৈশব নিও নাকো কেড়ে,
সমাজের কাছে আজ এই দাবী যে রে।

জীবন

শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

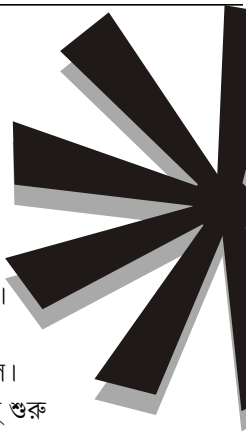

আলো আঁধারির খেলা শেষে
এলাম ধরণীবুকে নতুন বেশে
আরো একটি কাল করবো জয়
প্রাণে তাই নেই কোন ভয়।
কি জানি বিভক্ত হই তিনভাগে
মিলে মিশে এই চিরবিস্মিত জগৎতলে।
হার না মানার সেই খেলার আদি শুধু শুরু
চলতে হবে সুদূর পথ অনেক দূর।
সাধতে হবে অনন্ত সাধনা
অতিক্রম করেও থেকে যাবে যার ভাবনা
সেই খেলার নাম 'জীবন'
যার না আছে শুরু না সমাপ্তি
কেবল শেষে পবিত্র সুপ্তি।

লক্ষধরের সমস্যা এবং মধ্যযুগের একটি কাহিনী

শ্যামল বেরা

মধ্যযুগের কবি দয়ারাম দাস তাঁর 'ধূলাকুটার পালা' বা 'সারদামঙ্গল'-এ লক্ষধরের যে কাহিনী পরিবেশন করেছেন - তা থেকে বোঝা যায় লক্ষধর জ্বালাতনের ছেলে (প্রবলেম চাইল্ড)। লক্ষধরের সমস্যা সে লেখাপড়া শিখতে পারে না। রাজার পুরোহিত পন্ডিত গৌরীদাস বললেন —

পুরুষ হইয়া যদি বিদ্যা নাহি পড়ে।
বনের মালতী যেন অকারণে মরে।।
আগে নাহি পড়ে পাঠ পাছু গুণিয়া বিফল।
জীবন যৌবন তার সকলি নিষ্ফল।।
পুত্রকে পড়াইতে রাজা কেন কর হেলা।
শিশুকাল গেল পাঠ পড়িবার বেলা।।
রাজনীতি তাহারে শিখাবে আর কবে।
মূর্খের অনেক দোষ আপনি পাইবে।।

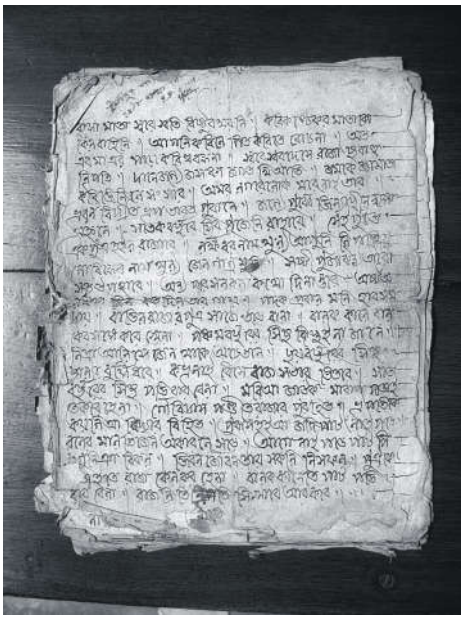

'সারদামঙ্গল' বা 'ধূলাকুঠার পালা'র পুথি

সুরেশ্বর দেশের রাজা সুবাহু পুরোহিতের পরামর্শে নানা উপচারে সরস্বতী পূজা সাঙ্গ করে 'পুত্রকে সঁপিয়া দিল পন্ডিতের হাতে'। কিন্তু পূর্বজন্মের পাঠ সাঙ্গ করে দক্ষিণা না দেওয়ায় লক্ষধর এ জন্মে কোন পাঠ গ্রহণ করতে পারল না। বারো বছর এ ভাবে কেটে গেল। রাজা কোতোয়ালকে আদেশ দেন মূর্খ পুত্রের মাথা যেন কেটে নেওয়া হয়।

রাজা বলে সশানে কাটিয়া আন মাথা।।
মূর্খ পুত্রে আর মোর নাহি প্রয়োজন।
কোতোয়াল সশানে লৈয়া করিল গমন।।

লক্ষধরের এ অবস্থা দেখে দেবী সরস্বতী তাকে দয়া করলেন। দেবীর কথায়, কোটালের অনুগ্রহে লক্ষধর পলায়ন করে। দেবী বনের মধ্যে বৃদ্ধার ছদ্মবেশে কুঁড়ে ঘর তৈরী করে, লক্ষধরকে আশ্রয় দেন। সে বনের কাঠ কেটে আনে, আর দেবী তা বিক্রি করেন। একদিন কুঁড়ের ভেতর পুথিপত্র দেখতে পেয়ে লক্ষধর ক্রুদ্ধ হয়ে তা জলে নিক্ষেপ করে। লক্ষধরের সমস্যা বাড়ে।

লক্ষধর তার দুঃখের কথা বৃদ্ধাকে জানায়। সব শুনে ছদ্মবেশী দেবী জানান - পূর্বজন্মে দক্ষিণা না দেওয়ার জন্য তার এই দুরবস্থা। এরপর দেবী বলেন - বৈদেব দেশের রাজার পাঁচ কন্যা পন্ডিত জনার্দনের কাছে বিদ্যাভ্যাস করে। সেখানে চার বছর থেকে বিদ্যার্জন করতে।

এরপর বৈদেব রাজ্যের পাঁচ রাজকন্যার সঙ্গে লক্ষধরের পরিচয় হয়। চাকর হিসাবে লক্ষধর সেখানে ঠাঁই পায়। সরস্বতী পূজার সময় তাকে বলা হয় সমস্ত রাত্রি জেগে থেকে পাহারা দিতে। কিন্তু 'যোগ নিদ্রা' তাকে গ্রাস করে। লক্ষধর ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন লক্ষধর ভয় পেয়ে যায় - 'মশানে কাটিবে মোরে রাজার কুমারী'। কিন্তু দেবীর কৃপায় লক্ষধর আবার মুক্তি পায়।

এদিকে পঞ্চকন্যা বিদেশে পড়ার জন্য পক্ষীরাজ তরণীতে করে পাড়ি দেয়। কৌশলে লক্ষধর তাদের সঙ্গে যাত্রা করে। লেখাপাড়া শেখে। অবশেষে পঞ্চ কন্যার সঙ্গে লক্ষধরের বিবাহ হয় এবং পিতা সুবাহুর সঙ্গে মিলনও ঘটে।

পুত্রবধূ লয়ে রাজা নিজগৃহে যায়।
সারদা চরিত্র দয়ারাম দাসে গায়।।

কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় লক্ষধরের সমস্যা হল পড়াশুনা কেন্দ্রিক সমস্যা। কবি দয়ারাম লক্ষধরের এই সমস্যা কাটিয়েছেন - লক্ষধর লেখাপড়া শিখেছে। এক সময় আমাদের গ্রাম সমাজে এই কাব্য গায়েনদের কণ্ঠে শোনা যেত। এখন এ কাব্য তেমন শোনা যায় না। মধ্যযুগের কবিরা লেখাপড়ার শেখার প্রকল্প এবং তাৎপর্যকে নিজস্ব কল্পনায় জারিত করে এ ধরনের কাব্য লিখেছেন - যা সময়ের প্রয়োজন মিটিয়েছে। উল্লেখ্য, কবি দয়ারাম দাস ছিলেন কাশীযোড়া পরগণার রাজাদের সভাসদ। কাশীযোড়া পরগণার অবস্থান অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া - কোলাঘাই থানা এলাকা। 'সারদামঙ্গল' বা 'ধূলাকুঠার পালা'র পুথি বর্তমান প্রতিবেদক কর্তৃক সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত রয়েছে এবং পুথিটি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে ২০১২ সালে।

ফুলটুসির মনের কথা

তাপস বাগ

ফুলটুসির মনের মধ্যে এখন অনেক প্রশ্নই উঁকি মারছে। আর হবে নাই বা কেন? এখন তো সে আর ছোট্ট খুকিটি নেই। এগারোতে পা দিয়েছে। স্কুলের পোশাক, জুতো-মোজা নিজে নিজেই পরে নেয়। নিজের হাতেই খাওয়া-দাওয়া করে। ইদানিং স্কুলের পোশাক পরতে গিয়ে ফুলটুসির মনে হয় ড্রেসটা যদি আরেকটু রংচঙে হত! ঐ বৃষ্টিদিনের আকাশে রামধনুর মতো যদি অনেকগুলি রং একসাথে থাকতো! বিশেষ করে যে সব বাচ্চারা আরও ছোট, মানে নার্শারিতে পড়াশোনা করে তাদের পোশাক কেন হাসপাতালের নার্সদের মতো হবে? আর একই পোশাক পরে রোজ কেন স্কুলে আসতে হবে? বাবা-জেঠুরা কি প্রতিদিন একই জামা-প্যাণ্ট পরে অফিস যান? স্কুলের আন্টিরাও তো নিত্যনতুন বাহারি শাড়ি পরে রোজ আসেন। একদম ছোটদের ক্ষেত্রে নিয়মের কড়াকড়ি একটু শিথিল করলে হয় না? স্কুলের ছোট বাচ্চাদের দু' থেকে তিন রকমের রংচঙে ড্রেস হওয়া উচিত। কোন ড্রেসটা কবে পরা হবে দিদিমণিরাই ঠিক করে দিক। এভাবে স্কুল ড্রেসটা নির্দিষ্ট দিন অন্তর বদল করে পরলে মনটাও চনমনে থাকে। ছোট বাচ্চারা তো রংচঙে পোশাকই ভালবাসে, তাই না! স্কুলের দিদিমণি-আন্টিরা একটু ভাবুন না!

স্কুলে ভর্তির আগে আরও কিছু বিষয় মা-বাবাদের খোঁজখবর করা উচিত বলে ফুলটুসির মনে হয়। যেমন রিঙ্কু, মিমি, টিকুরা তো অনেকটা সময় স্কুলে কাটায়। খেলতে গিয়ে ছুটোছুটি করার সময় যদি বড়সড় চোট-আঘাত লাগে বা কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে চটজলদি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা অথবা মেডিক্যাল সেন্টারের ব্যবস্থা সেই স্কুলে আছে তো? স্কুল পড়ুয়াদের প্রতি মাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় তো? পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন তো? মানে শিক্ষকরা যদি অনুপাতে কম থাকেন, আর ছাত্রছাত্রীরা খুব বেশি থাকে তাহলে সকলের দিকে তো আর সমান নজর দেওয়া যায় না। সেটা পড়াশোনার জন্য হোক বা অন্য কোনও বিষয়ের জন্যই হোক। সেজন্য প্রত্যেক অভিভাবকদের বিষয়টা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। শুধু স্কুলের নামধাম আছে বলেই সন্তানকে ভর্তি করে দিতে হবে এমনটা যেন না হয়। আর হ্যাঁ, স্কুলে আসার সময় ভুলেও যেন বাচ্চদের হাতে মোবাইল বা ভিডিও গেম জাতীয় বস্তু না দেওয়া হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকুক সরাসরি টিচারদের সঙ্গে গার্জেনদের। ফুলটুসি মনে করে টিভিতে যখন তখন কার্টুন দেখা ঠিক নয়। স্কুলেই থাকুক মনোরঞ্জনের কিছু বিষয়। বাচ্চাদের স্কুলে সপ্তাহে দু'তিন দিন থাকুক না গল্প বলার ক্লাস। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সুন্দর নীতিগল্প বা মজাদার গল্প শোনাক পড়ুয়াদের। সপ্তাহে অন্তত একটি দিন গান-বাজনা বা আবৃত্তি শেখার ক্লাস থাকলে বেশ হয়। থাকুক রুমাল চুরি, কানামাছি, লুকোচুরির মতো খেলাধুলো। এতে তো শরীরস্বাস্থ্যও চনমনে থাকে। মাসে এক-দু'বার আমাদের চারপাশের বিভিন্ন গাছ, পাখি, জীবজন্তুদের সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচয় করানো হোক। সমাজের সকল স্তরের শিশুরাই যেন স্কুলে আসে। পড়াশোনা করুক। ফুলের মতো হাসুক। নিজের দেশকে জানুক।

ফুলটুসির মনে আরও অনেক কথা জমে রয়েছে। সে সব না হয় পরেই হবে। সকলকেই সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা সহ সুস্থ-সুন্দর থাকার শুভ কামনা জানিয়েছে।

M/S Techno Fabricating Concern

Shanpur Bhagwan Das Math, P.O.- Dasnagar, Howrah-711105

Manufacturing of Impeller, Ducting, Casing, Chassis, Floor Plate, Gear Box etc.

Contact with -- Radha Raman Hazra & Kamalesh kumar Manna

Ph. - (033) 2667-6926

শিশুর আচরণ ঃ ধারণা ও প্রকৃত সত্য

মহুয়া দাস

অর্ঘ্য'র বাড়িতে ভীষণ হৈ চৈ। বাবা-মা তাকে ভীষণ বকাবকি এবং মারধোর করেছেন। কারণ তার স্কুল থেকে রিপোর্ট এসেছে — অর্ঘ্য শ্রেণীতে স্থির হয়ে এক জায়গায় বসছে না। শ্রেণীর কোনো কাজে মনোযোগ দিচ্ছে না। শ্রেণীর মধ্যে লাফালাফি দৌড়দৌড়ি করছে, নিজের বই খাতা পেনসিল গুছিয়ে রাখতে পারছে না বরং হারিয়ে ফেলছে। অযথা অত্যধিক কথা বলছে। প্রশ্ন করা হলে তা সম্পূর্ণ না শুনে আগেই উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। নিজের পালা আসা পর্যন্ত কোনো কিছুতেই অপেক্ষা করছে না সেটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই হোক বা খেলাই হোক। অর্ঘ্য'র বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল শুধু স্কুলে নয়, সে এধরণের আচরণ বাড়িতেও করছে গত সাত আট মাস যাবৎ।

শুধু অর্ঘ্য নয়, এমন সমস্যা আমাদের আশেপাশে অনেকের ঘরেই দেখা যাবে। শিশুদের এই আচরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের রাগের কারণ হয়। কিন্তু বিষয়টি বাবা-মা'র কাছে রাগের নয় চিন্তার। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এই লক্ষণগুলি শিশুর মধ্যে একটানা ছ'মাসের বেশী দেখা গেল তা Attention Deficit Hyperactivity Disorder বা ADHD'র। দশ পনেরো বছর আগেও এ দেশে ADHD'র নাম সেভাবে শোনা যেত না। কিন্তু এখন এটা খুব পরিচিত ব্যাপার। ADHD'র নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এই সমস্যা দু'ধরণের। —

১) Attention Deficit অর্থাৎ মনোযোগের অভাব, এবং

২) Hyperactivity অর্থাৎ অত্যধিক চঞ্চলতা।

এছাড়াও মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করেন যাদের ADHD'র সমস্যা আছে তাদের Impulsivity অর্থাৎ কোনো কিছু না ভেবেই কাজ করার প্রবণতা থাকে। এটি কিন্তু কোনো মানসিক বা স্নায়বিক রোগ নয়। এটি অটিজম, ভাষা বিকাশের সমস্যা, ব্যবহারগত সমস্যা, ডিসলেক্সিয়া, ডিসপ্র্যাক্সিয়া'র মতোই শিশুর ক্রমবিকাশের একটি সমস্যা।

ছেলেদের মধ্যে ADHD'র প্রভাব মেয়েদের মধ্যে এর প্রভাবের তুলনায় ৪-গুণ বা তার বেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে ৪-৫ বছর বয়স হওয়ার আগে শিশুর আছে কিনা বোঝা সম্ভব নয়, কারণ অমনোযোগিতা এবং চঞ্চলতা এই বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ADHD'র প্রাদুর্ভাব সব থেকে বেশি লক্ষ্য করা যায়। ১৫ বছরের পর থেকে বা বয়ঃসন্ধির সময় থেকে সমস্যা ক্রমশঃ কমতে দেখা যায়। তবে শুধু শিশুদের মধ্যেই যে ADHD'র লক্ষণ দেখা যায় তা নয়, কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যায়।

ADHD'র কারণ হিসাবে কোনো একটিকে নির্দেশ করা যায় না। জিনঘটিত ও জৈব পরিবেশ ঘটিত কারণ ছাড়াও এর মূলে আছে বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক কারণ। জন্মের পর শিশুর লালন পালন যদি তার ক্রমবিকাশের অনুরূপ না হয় তবে এধরণের ব্যবহারজনিত সমস্যা দেখা যায়। বাবা-মায়ের স্নেহ ভালোবাসার অভাব শিশুবিকাশের প্রতিকূলতার একটি অন্যতম অবস্থা। এছাড়া বাবা-মা এবং অতি প্রিয়জনদের মধ্যে অহরহ ঝগড়ার পরিবেশ, শিশুকে অতিরিক্ত বকাবকি বা মারধোর করা, উপেক্ষা করা, অন্য শিশুর সঙ্গে তুলনা করে তাকে হেয় করা বা তার কাজের খুঁত বের করার চেষ্টা করা শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত হানিকর।

ADHD একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা, তবে আশার কথা এই যে যাদের এই সমস্যা আছে তারা সময়মতো উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে সময়ের সাথে ও বয়স বাড়ার সাথে তাদের সমস্যা কমতে থাকে। যেহেতু সমস্যাগুলি জীবনব্যাপি, তাই বাবা-মা প্রিয়জনেরা ছাড়াও আশেপাশের সকলকেই এদের সহযোগিতা করতে হবে। বিশেষ করে স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাবা-মা'র পাশাপাশি চিকিৎসায় সহযোগিতা করলে সুফল পাওয়া যায়। বাড়িতে বা স্কুলে পড়ালেখার কাজ বা যে কোন কাজ করানোর সময় যে বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলি হ'ল —

(১) স্কুলে বা বাড়িতে এমন জায়গায় তাকে বসাতে হবে যাতে মনোযোগে সহজে বাধা না পরে। যেমন, জানালা বা দরজার পাশে না বসানো বা ক্লাসে সামনের দিকে বসানো যাতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নজর রাখতে পারেন।

(২) বিশেষ মনোযোগের দরকার এমন কাজের জন্য আলাদা শান্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করা।

(৩) শিশুটির ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় এমন কাজ দেওয়া।

(৪) সংক্ষেপে নির্দেশ দেওয়া।

(৫) একঘেয়ে কাজ বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা।

(৬) কাজকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দেওয়া।

(৭) ঠিকমতো কাজ করলে বারবার প্রশংসা করা।

(৮) বড়-দল না করে দু-তিন জন মিলে করতে দেওয়া।

(৯) ভালো কাজের জন্য টোকেন দেওয়া, যেগুলি জমিয়ে পরে ভাল পুরস্কার পাওয়া যাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

(১০) কাজ ঠিকমতো না হলে টোকেন ফিরিয়ে নেওয়া হবে সেটাও বুঝিয়ে দেওয়া।

(১১) ভাল কাজের পুরস্কার হিসাবে তাকে তার পছন্দমতো কেলা বা কার্টুন কিছুক্ষণের জন্য দেখতে দেওয়া যেতে পারে।

ADHD'র শিশুদের ব্যবহার নিয়ে অনেক বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সাধারণ মানুয়ের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে এই শিশুরা ইচ্ছে করে অন্যকে উত্তক্ত করার জন্য, কারো কাজে বাধা দেওয়ার জন্য, কেবল স্বার্থপরতার বশে এই ধরণের কাজ করছে বা এগুলি তার নিছকই দুষ্টুমি। তাই এদের কঠিন শাস্তি দিলে বা মারধোর করলে ব্যবহার ঠিক হয়ে যাবে।

দুর্ভাগ্য এই যে ধারণাগুলি বহুদিন ধরে চলে এলেও এগুলি ভুল। শারীরিক বা মানসিক শাস্তি দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী কিছু শিশুকে শেখানো যায় না। বরং শিশুকে মারধোর করলে সে ভাবতেই পারে যে কারো কাজ ঠিক না হলে তাকে মারাটাই পদ্ধতি বা স্বাভাবিক ব্যবহার। বড়রা যখন সে ব্যবহার করছে তখন সেও তা করতে পারে। তাহলে, কাউকে মারা অন্যায় নয় — এমন ধারণা শিশুর হওয়া শুধু ভুল নয়, বিপজ্জনকও।

শিশুরা অবশ্যই সাধারণ শিশুর মত চঞ্চলতা, অন্যমনস্কতা, ধৈর্য্যের অভাব এবং দুষ্টুমি করতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা শিশুর নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। তাই বাবা মা, আপনজনেরা এবং স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই ধরণের শিশুকে শাস্তির পরিবর্তে সহযোগিতা করুন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের সাহায্য নিন।

প থ স ঙ্গী মা কা লী

মলয় বসু

একবার শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরে গিয়েছিলাম এক আত্মীয়ের বাড়ি। ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে চল্লিশ মিনিটের হাঁটা পথ। ফিরে আসতে একটু সন্ধ্যে হয়ে যায়। খুব করে বলেছিলেন থেকে যেতে কারন অন্ধকারে একা পথ চলা অসুবিধা এবং ভয়ও করবে। মধ্য কোলকাতার ছেলে, ভয় করলে চলবে?

ঐ দেবানন্দপুর নিয়েই শরৎচন্দ্রের ঠ্যাঙাড়ের কাহিনী পড়েছি। দূর থেকে পথিকের গোড়ালি লক্ষ্য করে অব্যর্থ টিপে লাঠি ছুঁড়তো, পথিক পড়ে গেলেই তার সর্বস্ব লুঠ করতো।

রাস্তার দু'ধারে উঁচু জমিতে জঙ্গলের মত গাছপালা, দিনের বেলা আসার পথে দেখেছি। রাস্তা কিন্তু ছিল ভালই এবং সোজা। সময়টা যেহেতেু শরৎচন্দ্রের সময় নয় তাই ঠ্যাঙাড়ের ভয়টা ছিল না বরং অনেক বেশী ভয় ছিল রাস্তার দুধারে পুকুর বা ডোবার। ঐ অন্ধকারে ডোবায় পড়ে গেলে ঠ্যাঙাড়ের ঠ্যাঙানির চেয়েও মারাত্মক কিছু হবে ভেবে পায়ের স্টেয়ারিং খুব কন্ট্রোল করে হাঁটছিলাম, ডানদিক নয়, বাঁদিক নয়, একদম সোজা।

ধূমপায়ী হওয়ায়, দেশলাই বস্তুটা সঙ্গেই ছিল। ঘন ঘন ওটার সদ্ব্যবহার করে দশ ফুট করে এগোচ্ছি। শিয়ালদার ছেলে আমি, দর্জিপাড়ার তো নয়, তাই কিছুটা ভয় অবশ্যই ছিল। হিন্দি গান গাইতে গাইতে চলেছি, বাংলা গানে বোধহয় ভয় কাটে না।

হঠাৎ শুনি ঘুঙুরের আওয়াজ। চলমান ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে চলমান আলোর দিশা। সামান্য সেই আলোতে দেখতে পাচ্ছি মা কালীর অবয়বের মতই কিছু। ভয় না পেয়ে ভেবে নিলাম - আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন স্বয়ং মা কালী। আমি হিন্দি গান ছেড়ে শ্যামাসঙ্গীত ধরলাম। যুগে যুগে কত অবতার মা কালীর দর্শন পেয়েছেন, আমিও তাঁদের একজন ভেবে বেশ পুলকিত হচ্ছিলাম। মায়ের পদযুগলের ঘুঙুরের আওয়াজের তালে তাল মিলিয়ে আমিও নির্ভয়ে পা ফেলছিলাম। অভূতপূর্ব সে অভিজ্ঞতা। অনেকটা পথ এমনি হাঁটার পর, একটু আলো। শ্যামা মা ওখানেই স্থির হয়ে গেলেন। মায়ের সঙ্গে আমার দূরত্বের ব্যবধান শূণ্যে এসে গেল। দেখি - এক জীর্ণ ঝুপড়ির সামনে স্বয়ং মা। মায়ের চারটে হাতের দু'টো ফিক্সড্, বাকি দু'টোর একটাতে বাতি আর একটি বাড়িয়ে দিয়ে ভিক্ষে চাইল। মা কালীকে তো আর ভিক্ষে দেওয়া যায় না, প্রণামী দিলাম। জীর্ণ ঝুপড়িটা ছিল একটা চায়ের দোকান। মা তার ডিট্যাচেবল জিভ খুলে পোষাকের অন্তরালে রাখল এবং আমার সঙ্গে চা খেল।

সামনেই ব্যাণ্ডেল স্টেশনের ঝলমলে আলো দেখতে পেলাম। প্রণামী পেয়ে, চা খেয়ে কালী মা আমার সঙ্গ ছাড়ল, বাকী পথ ছিল সহজ সরল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম।

Abraham Lincoln's letter to his son's teacher

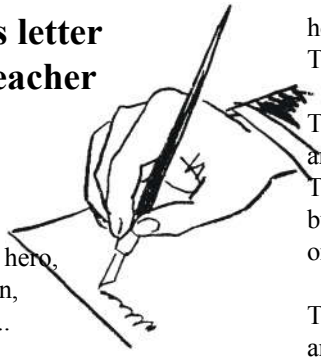

He will have to learn, I Know,
that all men are not just,
But teach him also that
for every scoundrel there is a hero,
that for every selfish politician,
there is a dedicated leader.....

Teach him that for every enemy
there is a friend.
It will take time, I know:
but teach him if you can, that a dollar earned is
of far more value than that of found...
Teach him to lose....
and also to enjoy winning.

Steer him away from envy, if you can:
teach him the secret of quiet laughter,
teach him, if you can,
the wonder of books.....

But also give him quiet time
to ponder the eternal mystery
of birds in the sky,
bees in the sun,
and flowers on a green hillside.

In school teach him
it is far more honourable to fail
than to cheat .....
Teach him to have faith in his own ideas
even if everyone tells him they are wrong...
Teach him to be gentle with gentle perople,
and tough with tough....

Try to give my son
the strength not to follow the crowd
when everyone is getting on the band wagon.
Teach him to listen to all men ..
but teach him also to filter all he hears
on a screen of truth,
and take only the good that comes through....
Teach him, if you can,
how to laugh when he is sad....
Teach him there is no shame in tears.

Teach him, to scoff at cynics
and to beware of too much sweetness....
Teach him to sell his brain to the highest bidders,
but never to put a price tag
on his heart and soul.

Teach him to close his ears to a howling mob
and stand and fight.
Treat him gently,
but do not cuddle him,
because only the test of fire makes fine steel.
Let him have the courage to be
impatient
let him have the patience to be brave.

Teach him always
to have sublime faith in himself
because then he will always have
sublime faith in humankind.

This is a big order,
but see what you can do....
He is such a fine little fellow
my son.

ব ল্ কে ন

অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

দরদরে ঘাম কেন গরমের দুপুরে
মাছ কেন খাবি খায় বোসেদের পুকুরে।
লঙ্কায় ঝাল কেন টক কেন আমড়া
জামটা নীল কেন, আম কেন ল্যাংড়া।
চিনি কেন নুন নয় কেন টক দই
টাকাটা তুলতে গেলে কেন লাগে সই।
শীতকালে কেন শীত কেন নয় বর্ষা
কেন রাত দিন নয় কেন দিন ফর্সা।
লেখাপড়া থাকুক না পরীক্ষাটা কেন রে
মাইনেটা দাও যদি কেন নয় পাস রে।
উত্তর এ সব তুই অভিধানে পাবিনা
মাথাটা খারাপ হবে ভাবতে যাবি না।

মানুষ হবার পাঠ

(সন্তানের গৃহশিক্ষককে লেখা জন আব্রাহাম লিঙ্কনের চিঠির ভাবানুবাদ)

অনুবাদ - প্রদীপ ভট্টাচার্য

প্রণাম নেবেন আপনি আমার
শুনুন গুরুমশাই
কি শেখাবেন বাছারে মোর
সেই কথাটা জানাই।

ন্যায্য মানুষ হয়না সবাই
তা তো সবাই জানে
কিন্তু অসৎ লোকের পাশাপাশি
কেউতো থাকেন
যাঁকে সবাই মহান মানে।

খারাপ লোকে দুনিয়া ঠাসা
সেটা যেমন সত্যি,
তেমন
স্বার্থবিহীন আদর্শবান মানুষও আছেন,
মিথ্যা নয় কো একরত্তি
যেমন শত্রুতার সঙ্গে পাবেন
অবাক করা দোস্তি।

বসে বসে কিছু পেলে
সবাই তো হয় খুশী
কিন্তু
ঘাম ঝরিয়ে যা পাওয়া যায়
তার মূল্যই বেশী।

যত্ন করে শেখান ওকে
ঈর্ষা থেকে থাকতে দূরে
শেখান ওকে কেমন করে থাকতে হয়
আপন মনে, গানের সুরে।

শিখুক বাছা, গোপন হাসি
বজায় রাখতে নিজের মনে
অবাক করা বই এর জগত
ঠাঁই যেন পায় ঘরের কোণে।

উন্মোচিত হয় যেন তার
অন্তরের দৃষ্টি
কাজের অবকাশে একটু ভাবুক
এই সুমহান সৃষ্টি —
তার রহস্য, ওই নীলাকাশ, বিহঙ্গকূল,
রৌদ্রস্নাত গুঞ্জরিত যত অলি
বনের মাঝে রংবেরং-এর কুসুমকলি
ওই পাহাড়ের গা বেয়ে সব তরুর সারি
অবাক করা ফুলের বাহার
কেমন
করে এল এরা
এমন মহান কীর্তি কাহার!

ভালো করে জানুক বাছা
অসৎ পথে ঠকিয়ে যারা
সফল হতে চায়
দশের কাছে সেই মানুষের
মান রাখাটাই দায়।
তাহার থেকে
সম্মানীয়, চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া
আঁকড়ে ধরে
সত্যকে যে, তার মনে বয় খুশির হাওয়া।

গড্ডলিকা প্রবাহে তো
সবাই ভিড়তে চায়
ছোট্ট সোনা ভুলেও যেন
সেই পথে না যায়!
মন্দ-ভালো দুইই আছে
এই জগতে
ছাঁকনি দিয়ে ভালোটাকেই
ছাঁকতে হবে।
মাথা যেন বিকোয় না
সে যাকে তাকে
যে দেবে মান তাকেই
যেন ধরে রাখে
বাঁচার জন্য অর্থ লাগে
এ কথা নয় মিছে
তবে ছুটতে তাকে নিষেধ করুন
টাকার পিছে পিছে।

বন্ধু পাতান তাহার সাথে
মেশান প্রাণের সঙ্গে প্রাণ
তবে আদর দিয়ে করলে বাঁদর
জীবন হবে লবেজান
যেমন নাকি
আগুন তাতের পরীক্ষাতেই
বাড়ে ইস্পাতের মান।

জীবন পথে চলার জন্য
ধৈর্য্য চাই সবার আগে
তবে
মাঝে মাঝে অস্থিরতাও
কাজে লাগে।

লম্বা চওড়া ফর্দ দিলাম
ছোট্ট সোনার জন্য
দেখুন
কতটা কি করতে পারেন
যাতে
জীবন তার হয় ধন্য।

শিক্ষা এক চলমান প্রক্রিয়া

মৌসুমী চক্রবর্তী

শিক্ষা শব্দটি বহুবিস্তৃত এবং এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। সংস্কৃতি 'শাস' ধাতু থেকে এসেছে শিক্ষা যার অর্থ শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা বা নির্দেশ দেওয়া। আবার শিক্ষা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল বিদ্যা যা সংস্কৃত বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে — অর্থ জ্ঞান অর্জন করা। বৈদিক যুগে শিক্ষার অর্থ ছিল 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' অর্থাৎ বিদ্যা হল সেই যা সংস্কার মুক্ত করে। অবশ্য প্রাচীনকালের শিক্ষার ধারণা বদলে গেছে। এখন শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব শিক্ষাকে অনেক ব্যাপক বিস্তৃতি দান করেছে।

শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে লক্ষ্য বলতে সংকীর্ণ অর্থের শিক্ষা ও ব্যাপক অর্থের শিক্ষা এই দুটি বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব পড়ায় এখন শিক্ষা আর শিক্ষককেন্দ্রিক নয় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। শিশুমনস্তত্ত্ব মেনেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত, শিশুর মানসিক উৎকর্ষ সাধনা না হলে সেই শিক্ষা যান্ত্রিক ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যদি শিক্ষার্থীর মনের বিকাশই না হয় এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের মনের যোগ সাধনই না হয় তাহলে সেই শিক্ষা অর্থহীন। শিশুকে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে হলে ছোটবেলা থেকেই তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু বইয়ের বোঝা না চাপিয়ে তার মানসিক, শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সেই ছেলে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতে কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথা পরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে''। তাই তিনি প্রকৃতির কোলে শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আধুনিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। আজকের শিশু বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে ও বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার ভালোলাগা ও খারাপ লাগার কথা আমরা একবারও ভাবিনা, তার মৌলিক চিন্তভাবনার উপর আমরা গুরুত্বই দিই না। কিন্তু শিক্ষার মূল কথা 'মানুষকে মানুষ হতে শেখানো শুধু পুথির কথা কণ্ঠস্থ করতে শেখানো নয়'। শিক্ষা মানে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ অর্থাৎ শিশুর জন্মের সময় বেশ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে সেগুলির সঠিক বিকাশ ঘটানো।

যদি শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদান করা হয় তাহলে সেই শিক্ষা অনেক সহজ ও সরল হয়। যে শিশু গল্প শুনতে ভালোবাসে তাকে গল্পের মাধ্যমেই কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এতে তার ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পাবে ও কল্পনা শক্তি উদ্দীপিত হবে।

শিশুশিক্ষা বলতেই বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নাম উঠে আসে। তাঁদের মধ্যে যিনি 'শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক' বলে ঘোষিত হন তিনি হলেন রুশো। তাঁরই চিন্তাধারায় শিশুর শিক্ষা সংক্রান্ত বিপ্লব ঘটে। পেস্টালৎসীও তাঁরই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক কাজে সক্রিয় এবং জ্ঞানের বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলার জন্য 'বস্তু ভিত্তিক পাঠ' নামক একটি শিক্ষা কৌশলের কথা উল্লেখ করেন। তিনি পরোক্ষভাবে মুক্ত শৃঙ্খলার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়োগ করে শিক্ষাকে অনেকাংশই পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। তাঁকে 'মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষানীতির জনক' বলা হয়।

সমসাময়িক কালে ফ্রয়েবেলও শিশুর আত্ম সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ও শিশুকে একটি চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করে তার বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যার নাম দেন 'কিন্ডার গার্টেন'। উদ্দেশ্য ছিল শিশুর স্বাধীন সক্রিয়তা অর্থাৎ শিশুরা নাচবে, গান গাইবে এবং বিভিন্ন খেলা নিয়ে খেলবে। তিনি শিশুর ইন্দ্রিয় সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছু খেলনা নিয়ে খেলার ব্যবস্থা করেন যার নাম দেন 'উপহার'। ফ্রয়েবেলের মত মন্তেসরীও তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে যেসব খেলনা তৈরী করেন তার নাম দেন 'ডিড্যাকটিভ যন্ত্র'। এঁরা উভয়েই খেলা ভিত্তিক শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন ও চেয়েছিলেন শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দানের মধ্য দিয়ে শিশু মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে।

তবে বর্তমানে 'কিন্ডার গার্টেন' বা 'মন্তেসরী' নামে অনেক স্কুল গড়ে উঠেছে বা উঠছে কিন্তু তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতির কোন অংশই কার্যকর হচ্ছে না। তাঁদের বক্তব্য ছিল শিশু শিক্ষা মানেই শিশুর ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ বা আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা যা একজন শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে পুঁথিগত। সেখানে শিশুদের যথাসময়ে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। তারপর তাদের উপর পাঠ্যপুস্তকের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। শিশুদের পড়ানোর উপযোগী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও অভাব। ফলে শিশুরা এই বোঝা না বহন করতে পারলেও বাধ্য হয় বহন করতে। এ যেন এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়েছে।

অ স মা প্ত

উত্তম কুমার পাল

বাঁকানগর নামটা মাম্পি এর আগে কোনদিন শোনেনি। এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়ি। যাবার প্রয়োজনে এই নাম শোনা। বিয়ে বাড়ি। মাম্পির বাবার যাবার ইচ্ছে থাকলেও মায়ের যাবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু মাম্পি যখন শুনল সেখানে 'আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ো' নয় আছে বদ্যি বুড়ি যার বয়স একশো পেরিয়ে গেছে, সেই বুড়ির গোটা শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে অথচ একটা দাঁতও পড়েনি আর এখনও চোখে চশমা ওঠেনি তবুও দিব্যি চালের কাঁকর বাছতে পারে। শুধু কী তাই! এখনও সেই গাঁয়ে কতো কতো পুরনো দিনের জিনিস দেখা যায় যা দেখার জন্য মাম্পি শুধু নয়, এ যুগের মেয়ে, শহরের মেয়ে মাম্পির মা-ও বলল এই সুযোগে একবার ঘুরে এলে মন্দ হয় না।

মাম্পি তার ভাই বুম্বা, মা আর বাবা সকলে মিলে বাঁকানগরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। সেখানে মাম্পির বাবার মামার বাড়ি। সেই বাড়ির মেয়ের বিয়ে। বাবার দিদিমা হল সেই 'আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ি'। ট্রেন থেকে নেমে বাস,বাস থেকে নেমে রিক্সা, তারপর নদী আবার রিক্সা আবার নদী তারপর আবার হাঁটা। মাম্পি মনে মনে ভাবছে গ্রামের নাম বাঁকা হবার কারণ কী। এতো ভাববার কী আছে? বাবা তো সঙ্গে আছে, জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। মাম্পিরা না হয় এই প্রথম আসছে কিন্তু তার বাবাতো নিশ্চয় এর আগে অনেকবার এসেছে। এ প্রশ্ন নিশ্চয় তার মনেও ছিল হয়তো উত্তরটাও জানা আছে। কোন কথা নয় সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা, 'বাপি, বাপি তোমার মামার বাড়ির এমন বাঁকা হল কেন'?

মেয়ের প্রশ্ন শুনে অরিন্দমবাবু চিন্তায় পড়লেন। ছেলেবেলায় অনেক বারই এসেছেন কিন্তু এমন প্রশ্ন কোনদিন মনে জাগেনি যা মেয়েটা করে বসল। উত্তর না দিলে নিজেকে ছোট মনে হবেই তাই খুঁজে পেতে বললেন, আসলে কি জানিসতো গ্রমের পাশ দিয়ে যে নদীটা গেছে সেটা ভীষণ আঁকা বাঁকা তাই এ গ্রামটার নাম বাঁকানগর। ব্যাখ্যা শুনে মাম্পি অসন্তুষ্ট হয়নি কেননা এটা হতেই পারে। হয়তো নদীর চর ভরতে ভরতে একটা গ্রাম হয়ে গেছে আর নদীটায় যেহেতু অনেক বাঁক তাই অনেক আগের কালের মানুষরা এরকম একটা নাম দিয়েছে। সে যা হোক ট্রেন বাস রিক্সা শেষ করে এখন ওরা নদী পার হচ্ছে। নদীতে প্রায় জল নেই বললেই হয় শুধু বালি আর বালি। কচি কচি নরম পায়ে নরম বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে কী ভালো না লাগছে ওর। সব কষ্ট ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে মন থেকে। দু'দিন পরে আবার শহরে ফিরে যেতে হবে সেকথা ভুলেই গেছে। এখন অপেক্ষা সেই বুড়ির দেখা পাওয়া। শুধু তাই নয় আরো কত কিছু আমরা যা দেখিনি অথচ আজকের বয়স্করা তাদের ছেলেবেলায় দেখেছিলেন। মাম্পির হঠাৎ খেয়াল হল বাবার দিদিমা তাকে কি বলে ডাকব। সঙ্গে সঙ্গে মাকে জিজ্ঞেস করল 'আচ্ছা মা বাবার দিদিমাকে আমরা কি বলে ডাকব?' রনিতা কি উত্তর দেবে ভেবে পেলনা। আসলে এতো সম্পর্ক নিয়ে কোনদিন ঘাঁটাঘাঁটি করেনি তাই সে জানবে কী করে? বলল তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর। বাবা বলল বড়মা বলবি। তবু কিছুটা আশ্বস্ত হল মাম্পি আর বুম্বা। খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলো একটা খোলা জায়গায় কতকগুলো ছেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান খেলা খেলছে। মাম্পি ও বুম্বা দাঁড়িয়ে পড়ল খানিকটা। কটা ছেলে গুলি খেলছে, কটা মেয়ে কি খেলছে বুঝতে পারল না বাবাকে জিজ্ঞেস করল ওরা কী খেলছে? ওটা ওল চিকেমার খেলা আর ঐ যে ওদিকে ওরা বউ বসন্ত খেলছে।

— কই আমরা তো ওসব খেলিনা.

— আসলে এসব খেলা গ্রামে দেখা যায়। শহরে আর এসব দেখা যায় না। আমাদের ছেলেবেলায় আরো অনেক খেলাই খেলেছি এখন সবই তো ঘরের মধ্যে হয়ে গেছে। একদিকে যেমন সময় নেই অপরদিকে সে সুযোগও নেই।

— সত্যি বাবা আমার অনেক কিছুই পাচ্ছি শুধু তোমাদের মুখ থেকে শুনে মন ভরাতে হচ্ছে।

চলতে চলতে ওরা এগিয়ে গেল আরো খানিকটা সেখানে কতকগুলো ছেলে মেয়ে বট পাতার মুকুট তৈরী করে মাথায় লাগিয়ে নিয়েছে আর আর রাজা রানী মন্ত্রী সেজে খেলছে। এ সব মাম্পিরা কল্পনাও করতে পারেনি।

দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছে গেল গন্তব্যস্থল। দেখতে পেলো দাওয়ায় বসে আছে সেই কিংবদন্তি বুড়িমা। মন ভরে গেল ওদের। পাশে কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিব্যি খোস মেজাজে গল্প বলছে। ওরাও বসে গেল পাশে। বুড়ির গোটা শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে কিন্তু টুক টুকে ফর্সা তাই চক চক করছে তার গা। বেঁটে খাটো বুড়িমাকে ভারি সুন্দর দেখতে লাগছে। বুম্বা বলল, 'বড় মা বড় মা আমাদের তো ঠাকুমা নেই তাই গল্প করতে পাই না। আমরা তোমার কাছে কিছু গল্প শুনব।' বুড়িমা বলল, কিসের গল্প শুনবি? — তোমাদের ছেলেবেলার গল্প। — হায়! এখন আর সে সব দিন আছে? আমরা মাটির পুতুল ন্যাকড়া দিয়ে কাপড় পরিয়েছি। ধুলোবালি খোলামকুচি লতা পাতা মালা এ সব নিয়ে রান্নাবাটি খেলেছি। এখন তো সে সব নেই এখন শুধু পড়া আর পড়া। তোমরা কত নাচগান শিখছ। আঁকা জোকা শিখছ। আমাদের তো ওসব ছিল না। আমরা

বিকেল হলেই ছুটে যেতুম ছাতিম তলার মাঠে। আমরা ধুলো বালি দিয়ে ঘর বানিয়েছি। দোকান দানা সাজিয়েছি। ছেলেরা ড্যাংগুলি খেলেছে। ঘেঁটু গেয়েছে। ফিষ্টি করেছি আরও আরও কত কিছু। কত বলব বলো। ঠিক তখনই ডাক পড়ল 'বুম্বা মাম্পি জামা কাপড় ছাড়তে হবেনা না কি?' মাম্পি বলল, এখানে মা বাঁধা নিয়মে চলতে হবে? আমাদের ছেলেবেলা তো চার দেওয়ালেই আটকে আছে। না হয় বড়মার কাছে গল্প শুনেই মন ভরাচ্ছি তাও সহ্য হচ্ছে না? মা হাঁক দিল — ঠিক আছে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে যত ইচ্ছে গল্প শোন।

শা শ্ব তী, তু মি যে র ক ম

প্রবীর ব্যানার্জী

বহুদিন পরে দেখছি নিবিড় সবুজ ঘাস
মখমলের গালিচার মত বিছিয়ে আছে বহুদূর —
তুমি তাতে নেমে এস বর্ষার প্রথম বৃষ্টি হয়ে,
ঘাসের সোঁদা গন্ধে জুড়িয়ে যাক আমার অন্তর।
এই যদি শুরু হয়, হবে তুমি আরও বহু কিছু —
বৃষ্টিশেষের রামধনু আর নদীতীরের সূর্যাস্ত,
নিথর, গভীর জলের দর্পণে শরৎশশী,
তার সাথে ঢাকের বাদ্যি আর ধূপধুনোর গন্ধ।
শিল্পীর হাতে স্পন্দিত তারতন্ত্র হবে তুমি,
বীণায় মধুর তান, বেহালায় করুণ মূর্ছনা।
কবীর কল্পনা হবে, আর ঋষির আনন্দ,
যুক্তি, বুদ্ধি, মনীষার হবে সরস্বতী।
পীন পয়োধরা আর নিবিড় নিতম্বিনী
তুমি সুরের মাধুর্যে অসুরকে করবে বিনাশ,
তোমার স্পর্শে পাবো অসীম আনন্দ,
কামধেনুর দুগ্ধপানে গভীর পরিতৃপ্তি।
আসলে তোমার কোন শুরু নেই, হবেও না কোন সমাপ্তি,
হিংসা, লোভ, স্বার্থের উর্দ্ধে সুচেতনা তুমি।
অসীম অনন্ত মাঝে তুমি সঞ্চারিনী —
তুমি শাশ্বতী, তাই আছি তোমাকে জড়িয়ে।

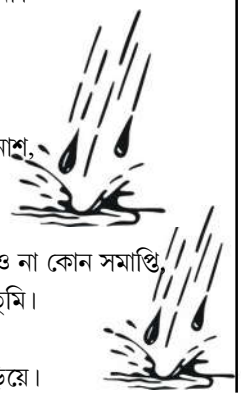

স্বা ধী ন তা হী ন তা য়

অমিত কুমার রায়

কদম কদম কদমফুল / গানের ইন্দ্রধনু বকুলফুল.....

স্বাধীনতা হীনতায় কেউ-ই বাঁচতে চায়না, আমি কোনো বিপ্লবী বীরের গল্প এখানে গাঁথছি না; তোমাকে শোনাবো এক সাম্প্রতিক চোখে দেখা মনে অনুভব করা গল্প।

কিশোর বেণুর রোজ এপথ দিয়ে মাসির বাড়ি সকালবেলা যাওয়া চাই ই। যাবার সময় আমাকে হাঁক দেয় দা-দু ! আমাকে টা টা, হাত নাড়া, নয়-তো বা ঘাড় নাড়তেই হবে।

আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ হবে, বেণু একটা কাঠির খাঁচা নিয়ে চলেছে — নিজেই চলতে পা টলে যায়, আবার খাঁচা! আমি বললাম দাদু-ভাই খাঁচা কি হবে?

— পাখি পুষবো!

— কোথায় পাখি?

— মাসির বাড়ি।

— কার মাসির বাড়ি, তোমার না পাখির!

— পাখির আবার মাসি আছে না কি। বলে ফিক করে হাসল।

— আছে তো। বাবা-মা, ভাই-বোন, পিসি-মাসি সবাই আছে।

— তারা কোথায় থাকে?

— পাখি আকাশে ওড়ে, গাছের ডালে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, তা-দেয়,বাচ্চা ফোটে-তারা স্বাধীন ভাবে বাঁচে।

— স্বাধীন কী?

— যেমন তোমাকে মা একা রাস্তায় ছেড়েছে, তোমাকে বেঁধে রাখেনি এটাই স্বাধীন।

— বেঁধে রাখলে খুব কাঁদতাম।

— তাহলে তুমি যদি পাখিকে খাঁচায় বন্দী কর তবে ও কাঁদবে, ওর মা কাঁদবে। ও আকাশ দেখতে পাবে না।

— তাহলে পাখিটাকে ছেড়ে দেবো। বেশ হবে।

বেণু যখন মাসির বাড়ি থেকে ফিরলো তখন মুখে তার বেলফুল উজ্জ্বল হাসি, সে উড়িয়ে দিয়েছে পাখিটাকে আকাশে, মুক্ত বাতাসে। পয়লা শ্রাবণ বেণু যখন মাসির বাড়ি যাচ্ছিল, তার কাঁধে বসে চকচকে শালিক ছানা! আমি বললাম কিরে বেণু!! কাঁধে শালিক ছানা! বেণু বলল, ওকে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, সে কথা ও ভোলেনি। শালিক গলা নিচু করে বলল, আমি ভুলিনি। .....পাখির নামটাও ভারি সুন্দর, রত্না!

আমার কানে গানের রেশ ভেসে আসে —

তখন একলা থাকা আমার এ মন /একটা সঙ্গী খোঁজে মনের মতন....

দ্রো ণা চা র্য

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

কাঞ্চনপল্লীকে এখন আর গ্রাম বলা চলে না। কলকারখানা, ঝঞ্ঝাট ঝামেলা, খুন জখম ও মারামারিতে সমৃদ্ধ রীতিমত শহর। ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজ ফাঁকি দিয়ে সিনেমা যায়, সন্ধ্যায় লোডশেডিং-এ বড় রাস্তা ছেড়ে নবজাত অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে গল্পটল্প করে।

সাধনের বাবা সন্ন্যাসীচরণ দাস সেই পল্লীর এক বাসিন্দা। বয়স তার ষাটের ঘরে। এখনও সে তার জাত ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ভোরে পুকুরে নামে, সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি ধোয়া জিনিস পৌঁছে দিয়ে, দরদাম ও ময়লা কাপড় নিয়ে বাড়ি ফেরে। সাধন দাস তার বাবাকে বারণ করেছে অনেকবার, সন্ন্যাসী সে কথায় কান দেয়নি। জাত ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধন ছোটবেলায় বাপের কাজে সাহায্য করলেও বড় হয়ে নিজের জন্য আলাদা কাজ বেছে নিয়েছে। কলেজের পড়া শেষ করে একটা স্কুলে চাকরি করে। চাকুরিটা ভালো, অফুরন্ত ছুটি। অন্তহীন অবসর টিউশানি দিয়েও পুরণ করা যায় না; হাতে বেশ সময় থাকে। তাই সাধনের একটা বাতিক জন্মেছে, লেখার বাতিক। স্থানীয় দু'একটা পত্রপত্রিকায় তার লেখা বার হয়। পাড়ার বা বেপাড়ার পরিচিত লোকেরা সন্ন্যাসীর ব্যাটার লেখার মধ্যে কোনও সাহিত্য খুঁজে পায় না, তবে অপরিচিত পাঠকরা সে লেখার প্রশংসা করে থাকে। দু'একজন অত্যুসাহী পাঠক পাঠিকা মাঝে মাঝে চিঠি লিখে লেখককে উৎসাহ জানায়।

সাধনের সাহিত্যচর্চ্চায় মাঝে মধ্যে ভাটা পড়লেও পুজোর কোটালে জোয়ার আসে। গ্রীল দেওয়া মোজাইক করা সুউচ্চ বাড়ি, সুন্দর বয়কাট বৌ, মারুতি গাড়ি কোনটাই তার কাম্য নয়। কামনার বিষয়, লেখক খ্যাতি।

কোলকাতার বড় পত্রিকার অফিসে লেখা পাঠালে তা ফিরেও আসে না, উত্তরও আসেনা। বোকারা সে লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার আশায় অপেক্ষা করে। সাধনও তাই করছিল। শেষে বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে সাধন তার মানস গুরু প্রসিদ্ধ লেখক গুরুপদ উপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করেছিল। তাঁর কোলকাতার বাড়িতে। কাগজের বড় বাক্স ভরতি সন্দেশ আর কিছু গল্পের পান্ডুলিপি কাপড়ের সাইডব্যাগে পুরে অন্ধকার গলির মধ্যে গুরুধামে এসেছিল।

ধুতিসার্টে মোড়া কালো গোলগাল চেহারার অপরিচিত যুবকটিকে সদরদরজা থেকেই বিদায় করা যেত কিন্তু সাধন গুরুপদর পদধূলি মাথায় নিয়ে কাগজের ভারি বাক্সটা তাঁর শ্রীকমল করে জমা দিলে কথাশিল্পী গুরুপদ ভক্তটিকে আর পত্রপাঠ ফেরাতে পারেননি, সদর ঘরে বসতে বলেছিলেন। তাঁর মূল্যবান হাসির একটু ভিক্ষা দিয়ে মিনিট দশেক কথাও বলেছিলেন। সাধন তার মনোবাসনা জানালে গুরু বলেছিলেন — খুব ভালো কথা। তুমি এখন পড়ে যাও। খুব পড়। যে বই সামনে পাবে তাই পড়বে। পঞ্চানন ঘোষালের অপরাধ বিজ্ঞান, আবুল হাসানতের যৌন বিজ্ঞান, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, কেশব সেনের পাটিগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বপনকুমারের গল্প যা সামনে পাবে তাই পড়বে। লিখবে, লেখার পর সেটা বেশ কিছুদিন ফেলে রাখবে। অনেকদিনের বাসি হলে টেস্ট করে দেখবে, তখনও যদি টক না লাগে, ভালো লাগে তবে আমাকে পাঠাবে, পছন্দ হলে আমার কাগজে ছাপাব।

সাধন প্রসন্নচিত্রে আবার গুরুজীর পায়ের ধুলো নিয়ে কাঞ্চনপল্লীতে ফিরেছিল। গুরুর কথামতো সাধন নতুন করে সাধনা শুরু করে। কয়েকটা টিউশনি ছেড়ে দিয়ে সে সময়টাও বই পড়ে কিংবা লেখে।

প্রায় একবছর পরে পুজোর মাস দুই আগে সাধন তার খাতা ভরতি গল্প আর নতুন ধুতি পাঞ্জাবি নিয়ে গুরুপদ উপাধ্যায়ের বাড়িতে আবার উপস্থিত হল। কোলকাতার বাইরে থেকে আসা সাধনকে চিনতে গুরুপদর অসুবিধা হয়নি। টেবিলের ওপরে রাখা ধুতিপাঞ্জাবি আর সন্দেশের প্যাকেটের দিকে চোখ রেখে মিষ্টি হাসি মুখে নিয়ে কথাশিল্পী গুরুপদ বললেন — তোমার একটা গল্প পড়ে শোনাও দেখি।

পাশেই একটা সোফায় বসেছিল তাঁর অনুগত এক শিষ্য, তরুণ লেখক। সাধনকে ইতঃস্তত করতে দেখে গুরুজী বললেন — ওকে দেখে লজ্জা করো না ও একজন নতুন লেখক। গুরুর আদেশে পুলকিত হয়ে সাধন তার খাতা থেকে একটা গল্প পড়ে শোনাল।

গুরুপদর চোখেমুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। সাধুবাদ জানাতে গিয়েও থেমে যায়। গুরুপদ উপাধ্যায়ের পাশে বসা তরুণটির মুখে ভেসে উঠেছে নীরব অভিযোগ। গুরুপদ নিজেকে সংযত করে বললেন — খারাপ হয়নি, সামান্য পরিবর্তন করলেই চলবে। তুমি বরং খাতাটা রেখে যাও। আমি দেখি ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারি কি না। কিছু পরিবর্তন করলে তোমার আপত্তি থাকবে না তো?

সে কথা বলছেন কেন? আপনার কলমের ছোঁয়া পেলে আমার তামার লেখা শোনা হয়ে উঠবে।

বেশ, তবে হ্যাঁ। এখন এসব লেখা ছদ্মনামে প্রকাশ করাই ভালো। তোমার ছদ্মনাম আছে না কি?

সাধন লজ্জায় মাথা নীচু করে জানাল - না।

গুরুপদ এই উত্তরটাই চাইছিলেন। খুশি হয়ে বললেন — বেশ আজ থেকে তোমার নতুন নাম দিলাম -- পার্থ সেনশর্মা। কথা দাও

আমার অনুমতি ছাড়া নিজের নাম প্রকাশ করবে না। নাম যশ প্রতিভাকে কলঙ্কিত করে।

পাশে বসা তরুণটি একবার নড়েচড়ে বসলে গুরুপদ উপাধ্যায় হাতের ইঙ্গিত তাকে স্থির হতে বললেন। গুরুপ্রসাদে মুগ্ধ হয়ে সাধন ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের সামনে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। তারপর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল - আজ আমার জীবন ও সাধনা সার্থক হল। কথা দিলাম আপনার অনুমতি ছাড়া নিজের নামে কোন লেখা প্রকাশ করব না।

সপ্তাহ দুই তিন পরেই কোলকাতার এক নামী সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ পেল পার্থ সেনশর্মার লেখা। সাধন দাস একবার, দু'বার বারবার সে লেখা পড়ল। আজ তার জীবনের সুখতম দিন। সামান্য কিছু নাম ধামে পরিবর্তন থাকলেও নিজের লেখা চিনতে সাধনের অসুবিধা হল না। হাজার হোক নিজের সন্তান তো। ইচ্ছা করছিল তার সহকর্মী, ছাত্রদের ডেকে লেখাটা পড়ায়, কিন্তু তার সাহিত্যগুরুর নিষেধ আছে। তা ছাড়া কে বা তার কথায় বিশ্বাস করবে যে পার্থ সেনশর্মা সাধন দাসের ছদ্মনাম। সমস্ত আনন্দটা যে একাই অনুভব করল একটু একটু করে। ভাগ নেবার কেউ নেই।

পরের সপ্তহে আবার লেখা, তারপরের সপ্তাহে আবার । টিচার্সরুমে সহকমীদের মুখে, ট্রেনে সহযাত্রীদের মুখে পার্থ সেনশর্মার প্রশংসা শুনে, সাধন আনন্দে আত্মহারা। সে নিজেও তাদের সঙ্গে পার্থর প্রশংসায় যোগ দেয়। কোন এক সহকর্মী ঠাট্টা করে বলে ওঠে — খুব তো পার্থ সেনশর্মার প্রশংসা করছিস, পার্থ যেন তোর এক গ্লাসের বন্ধু। নিজে তো অমন একটা লিখতে পারবি না।

সাধন এ কথায় রাগ করে না, আরও খুশি হয়। বলে আমি নাই বা পারি, পার্থ সেনশর্মা তো পারে। তার খ্যাতিতেই আমার খ্যাতি।

দু'চারটে নামী পুজো সংখ্যাতেও পার্থ সেনশর্মার লেখা ছাপা হল। বিজয়ার পরে ভট্টপল্লীর সাহিত্যসেবীরা এক বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক গুরুপদ উপাধ্যায় ও নবীন উদীয়মান কথা শিল্পী পার্থ সেনশর্মাকে সম্বর্ধনা জানান হবে। খবরটা সাধন দাসের কানে আসা থেকে সে চঞ্চল হয়ে পড়েছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল ভট্টপল্লীর একদল সাহিত্যসেবী তার বাড়িতে আসবে নিমন্ত্রণ জানাতে। কিন্তু বৃথা দিন গোনা। কেউই এলো না অথচ বিজয় সম্মেলনের দিন এসে গেল।

অনাহুত সাহিত্যিক সাধন দাস ভারী মন নিয়ে উপস্থিত হয় বিজয়া সম্মেলনে। সুন্দর মঞ্চ তৈরি হয়েছে, দূরে দশ জনের মাঝে বসে আছে সাধনের সহিত্যগুরু গুরুপদ উপাধ্যায়, পাশে সেই ছেলেটি যাকে গুরুপদর বাড়িতে দেখেছিল বলে, সাধনের মনে হল।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ঘোষণা করলেন - আজ আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক গুরুপদ উপাধ্যায় ও তাঁরই সঙ্গে এসেছেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রী পার্থ সেনশর্মা যিনি এ বছর সাহিত্য জগতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

সাধন বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখল গুরুপদ উপাধ্যায়ের বাড়িতে দেখা সেই সুদর্শন যুবকটি হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যপ্রেমী দর্শকদের সঙ্গে সাধনও আনমনে হাততালি দিয়ে ওঠে, জল ঝরে তার দু'চোখ বেয়ে।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ—

'জেলার খবর সমীক্ষা' নিয়মিত পাওয়া যাবে এখানে

মালঞ্চ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

দাশনগর বাজার, বিরাজময়ী রোড, হাওড়া - ৫

বই, খাতা, অফিস স্টেশনার্স, রঙ. তুলি, ডায়েরী, ক্যালেণ্ডার

দূরভাষ ঃ - ৯৮৩০৩৫৫৮৬৮

ছবি ঃ তরুণিমা ভৌমিক (তৃতীয় শ্রেণী)

নজরুল গীতি বিচিত্রা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

''নজরুল সত্তায় যেন এক অফুরন্ত সৃষ্টির সঞ্চয় লুকানো ছিল, রূপকথার কল্পবৃক্ষে ঝাড়া দিলেই যেমন তার থেকে সোনা রূপা ঝরে পড়ত, তেমনি তাঁর গানের গাছে নাড়া দিলেই চাইতে না চাইতে রকমারী গানের ফল টুপ করে খসে পড়ত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টিশীল প্রতিভা। নবনবোন্মেষশালিনী সুর সৃজনের প্রতিভায় তিনিই তাঁর তুলনা, তাঁর আর কোনো দোসর নেই।''

নজরুলের গানে কলহাস্যচঞ্চলা নির্ঝরিনীর প্রবাহ, চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্‌বেল তরঙ্গভঙ্গের অঞ্জলি বিক্ষেপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় — আর সেই নিরুদ্দেশের পথে রঙিন প্রেমের গজলে বিশ্ববীণায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে বিশ্বের অনাহত রাগিনী —

গুলবাগিচার বুলবুলি আমি রঙীন্ প্রেমের গাই গজল

(পৃঃ ৪৩১ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

মন সুপ্ত থাকলেও, দ্বার ছিল খোলা - সেখানে কার নিঃশব্দ চয়নের আনাগোনা - তার যাওয়ার পথে লুটিয়ে থাকে ছিন্নফুলের পাপড়ি; অন্তরের বেদনা নীরবতার ডালিতে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে —

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল

ঝর্ণার একপ্রান্তে কেবলই পাওয়া - সেখানে আছে অভ্রভেদী শিখরচূড়া; আর একদিকে কেবলই দেওয়া - অতলস্পর্শ সমুদ্রকে দেওয়া। জীবন যতই দেওয়া আর নেওয়ায় পূর্ণ হোক না কেন সেখানে আছে বিরহের অতলস্পর্শ —

পরি জাফরানী ঘাঘরি চলে শিরাজের পরী।

(পৃঃ ১১৮ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

রূপ জাগছে - জীবন থেকে মরণে; বাহির থেকে অন্তরে; জীবন তো ছন্দের দোলা - সেখানে নিয়ম যেমন আছে; তেমনি অনিয়মও আছে। তাই চেনার জগত থেকে অচেনার জগতে মনকে মুক্তি দিতে হয়; প্রকৃতির রঙে মনকে রাঙিয়ে তুলতে মাঝে মাঝে সাধ যায় —

প্রজাপতি ! প্রজাপতি ! কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা

(পৃঃ ১২১ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

'আজ বরবর্ণিনী অশোকমঞ্জরী তার চেলাঞ্চল আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে রক্তরঙের কিঙ্কিণীঝংকার বিকীর্ণ করে দিলে; কুঞ্জবনের শিরীষবীথিকায় আজ সৌরভের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য। মাধুর্যের অতল সমুদ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেছে।' নাচের ছন্দে আজ সবাহ ভেসে পড়েছে —

রুমঝুম রুমঝুম .....

(পৃঃ ১৭৬ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

'যৌবনের তীর্থক্ষেত্র অতনুর দেশে তরুণ - তরুণীর নিত্য সমারোহ। এই মহাতীর্থ তনুতে তনুতে অতনু দেবতার ক্ষণভঙ্গুর দেউল, কামনার রূপ সেখানে নিত্য জ্বলছে —

আজকে সাদী বাদশাজাদী সবে পান কর শিরাজী

(পৃঃ ৮ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

হৃদয়ের এই তীর্থক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য উদাসীন পুরুষ আর বিরহিণী নারীর অশ্রুমতী নদীর তীরে মিলন। নিবিড় বিরহের বেদনায় পুরুষ হয় নির্মম, উদাসীন বৈরাগী; সেই নিবিড় বিরহ নারীকে করে প্রেমময়ী। পুরুষ যে বিরহে হয় মরুভূমি, নারী সেই বিরহে হয় যমুনা। তরুণ, প্রেম পথযাত্রী সেই বিরহ যমুনার কূলে দাঁড়িয়ে গায় —

আকাশে আজি ছড়িয়ে দিলাম প্রিয়

(পৃঃ ৩ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

হে সুন্দর, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো। যে গানগুলি এতদিন গ্রহণ করেছো সেই তার আপন বন্ধনেই বাঁধা রইল তোমার দ্বারে - তোমার উৎসবলীলায় সে রয়ে গেল চিরদিনের সাথী - তোমাকে সে তার সুরের রাখী পরিয়েছে - তার চির পরিচয় তোমার ফুলে - ফুলে তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায় —

আসিবে জানি তুমি প্রিয়

(পৃঃ ২৮ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

এখনো কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে - এখনো শিরীষবনের পুষ্পাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে একটা বেদনা - সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারার সুর বাঁধা হচ্ছে - মনে হচ্ছে, যেন বাসন্তী রঙ ম্লান হয়ে গেরুয়া রঙে নামল —

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?

(পৃঃ ২১৮ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

অভিমানী সুরের কবি অকারণে অকরুণ হয়ে ওঠে মনে। তার কেবলই মনে হয়, হৃদয়ের জলাভূমিতে নিশীথ রাতে যে আলো দেখা যায় তা আলো নয় - আলেয়া। এই প্রেমতীর্থে সে তাই বসে থাকে উদাসীন সন্ন্যাসীর মত। অর্ঘ্য নিয়ে যদি আসে কোনো নিবেদিতা তাকে সে দেয় ফিরিয়ে। সে যেন বলতে চায় —

আমায় নহে গো ভালবাস, ভালবাস মোর গান

(পৃঃ ২০ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

সুদূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে পথিক চলে যায় - একটা কোন্ অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বুকের ভিতর রেখে যায়; বিচ্ছেদের ডাক শুনতে

পাই কোন নিলীম কুহেলিকার প্রান্ত থেকে - উদাস হয়ে যায় মন - ভৈয়বী রাগিনীতে বাজে বিচ্ছেদের বাঁশি —

সহসা কি গোল বাঁধালো পাপিয়া আর পিকে

(পৃঃ ১৮৫ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

বিদায়দিনের প্রথম হাওয়াটা উৎসবের মধ্যে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠল। এখনো কোকিল ডাকছে - এখনো বকুল বনের সম্বল অজস্র - তবু চঞ্চলতার অন্তরে বেদনার আভাস - পথিকের নয়নে বেদনার অসীম সাগর পারের বাণী; কিন্তু পথিক অশ্রুজল তো তোমার জন্যে নয়; তোমার চোখের জল মুছে আমাদের নিয়ে চলো অগম পারে —

মুশাফির মোছ রে আঁখিজল

'হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।' পূর্বরাগের পথবেয়ে, অভিসার শেষে সে প্রেম পূর্ণতা পায় আত্মসমর্পণে - 'কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ ঃ তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ

নূরজাহান নূরজাহান .....

(পৃঃ ১১৪ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

সুখদুঃখের মালা গাঁথব টুক্‌রো টুক্‌রো করে; সাতনরী হার পরাব তোমাকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি চুনে নিয়ে; ফাগুনের ভরা সাজি থেকে বনের মর্মর তুলে নিয়ে বাণীর সূত্রে গেঁথে পরিয়ে দেব তোমার মণিবন্ধে। হয়তো আগামী বসন্তে - আমি না থাকলেও আমার ভূষণ পরে তুমি আসবে - তোমার আমার এ দেখা অনন্ত মুহূর্তের প্রদীপালোকে চিরপ্রোজ্জ্বল হোক্ —

আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়

(পৃঃ ৪২৮ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে 'লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটি মঞ্জুর হল। তার প্রণাম তুমি নাও। তার গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে। তার সুরের রাখী তুমি গ্রহণ করেছো, তার পরিচয় রইল তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত কোমল শষ্প বীথিকায় —

প্রিয়তেম হে বিদায়

(পৃঃ ১২৪ / নজরুলরচনাসম্ভার/১ম খন্ড)

ওষুধ বিক্রেতার ডাক্তারি

ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য

মাথা ব্যথা? পা কেটে গেছে? সর্দি হয়েছে?

জ্বর হয়েছে? কাশি? গায়ে ব্যথা?

এরকম নানা কারণে আমরা সরাসরি ওষুধের দোকানে যাই। দোকানের দাদা বা ছোট ছেলেটি যে ওষুধ বিক্রি করছে শুনেই একটা বা দুটো বা তার বেশী ওষুধ পাতা থেকে কেটে দিয়ে দেন। আমরাও নির্দ্বিধায় খেয়ে নিই। একবারও আমাদের ডাক্তার বাবুর কথা মনে পড়ে না। পড়লেও মনে হয় যে এইটুকু কারণে ডাক্তারের কাছে যাব? আবার ফিস্! কিন্তু আমরা যে কতবড় ভুল করি সেটা আমরা তার কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারি যখন সেই উপসর্গের বৃদ্ধি অথবা পুনরাবৃত্তি হয়। আমরা কখনও ভেবে দেখি না যে সেই দোকানের দাদা বা ছোট ছেলেটি যার ওষুধ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই যে ওষুধ দিলেন সেটা দেওয়া এবং খাওয়াটা ঠিক হবে কি না। আমরা খুব সাধারণভাবে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেই জিজ্ঞাসা করি যে ডাক্তারবাবু নিজে যা ওষুধ লেখেন তার কোন অথবা কি কি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু আমরা কখনই একথা আমাদের প্রিয় দোকানের দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না। কারণ দোকানের দাদা ডাক্তার নয়। কিন্তু তাতে কী? তার দেওয়া ওষুধ খেতে তো কোন দোষ নেই।

এই যে শুনছেন! আপনাকে বলছি। আপনাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে। আপনি কি জানেন যে দোকান থেকে মুখে বলে নেওয়া ওষুধের মধ্যে বেশীরভাগই থাকে ব্যথা নিরোধক ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক ও গর্ভনিরোধক ওষুধ। আপনি কি জানেন যে আপনি যে ব্যথা নিরোধক ওষুধ খাচ্ছেন তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আপনার শরীরে নতুন রোগের জন্ম হতে পারে? আপনি কি জানেন যে যেসমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক দোকান থেকে দেওয়া হয় তার বেশিরভাগেরই পুরো কোর্স খাওয়া হয় না যার ফলে একই রোগ বার বার আরও তীব্ররূপে ফিরে আসে। আর তাছাড়া যে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স কমপ্লিট হল না সেই জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক আপনার শরীরে এ জীবনে আর কাজ করে না।

কেন নিজের ক্ষতি এভাবে ডেকে আনেন? যা সহজ তাকে সহজ অবস্থায় শুধু মাত্র ডাক্তারবাবুকেই সমাধান করতে দিন না। কারণ ডাক্তারবাবুর কথাই শেষ কথা।

প রা র্থ

সূজয় বাগচী

দিনটা রবিবার। সোমেশ্বর আর অদিতি পুজোর আগে মেয়ের বাড়ী এসে পৌঁছালেন। অদিতি একটু ভুগছে। সোমেশ্বর বুঝতে পারছেন না রোগ শরীরে না মনে। তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে পুজোর বাজার করে অদিতিকে নিয়ে সোজা মেয়ের বাড়ি। মেয়েকে কাছে পেলে অদিতি যে ভালো থাকে সেটা সোমেশ্বর জানেন। সোমেশ্বর আর অদিতির একমাত্র মেয়ে শান্তি। দেখতে দেখতে মেয়ে বড় হ'ল। বিয়েও দিতে হ'ল সামাজিক নিয়ম মেনে। শান্তির স্বামী জয়ের বদলির চাকরি। আজ বার্ণপুর তো কাল ভিলাই। সে যেখানেই মেয়ের বদলি হোক আদিতিকে সঙ্গে নিয়ে সোমেশ্ব র ঠিক মেয়ের কাছে হাজির হয়ে যায়। নিজের কাছে মেয়েকে রেখে দেওয়ার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছে যে একেবারে সোমেশ্বরের নেই সে কথা বলা যাবে না। একটানা বেশীদিন মেয়েকে না দেখেও থাকতে পারেন না। মেয়ের বাড়ি এলেও সোমেশ্বর কিন্তু জামাইয়ের অর্থ খরচ করার পক্ষপাতি নন। তাই সংসারের অনেক কিছুই নিজের টাকায় কিনে আনেন। জামাই এজন্য রাগ দেখায় ঠিকই, কিন্তু সোমেশ্বর নিজের যুক্তিতে অনড়। জয় একটু বেশি হিসেবি, তা বলে কৃপন নয়। শান্তি আর জয়ের এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে। তাদের পড়াশুনোতে বেশ প্রভাব পড়ছে বদলির জন্য। বদলির চাকরি তে ঘর গেরস্থালি ঠিক গড়ে ওঠে না। মনের মতো করে সংসার সাজানোই যায়না। তাই শান্তি আর বাচ্ছাদের জন্য একটা স্থায়ী ঠিকানা বানানোর ইচ্ছে জয়ের অনেকদিনের। নানা জায়গায় ফ্ল্যাট দেখা চলছিল। সেই সময় সোমেশ্বরই জামাই মেয়েকে নিজের একতলা বাড়িটাকে দো'তলা করে থাকার কথা বলেন। তাঁর কিছু হয়ে গেলে অদিতিকে কে দেখবে এই চিন্তা থেকেই সোমেশ্বর বাড়িটাকে দো'তলা করবার বুদ্ধি দেন। ফ্ল্যাট কেনার কথা বাতিল করে জয় অবশেষে শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজি হয়ে একতলা বাড়িটাকেই তিনতলা করার কাজ শুরু করেছে। যদিও দু'তলা করার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু প্ল্যানারই বুদ্ধি দিল তিনতলা করে নিয়ে সামান্য ফাইন দিয়ে দিতে। আর এখন তো এসব হামেশাই হচ্ছে কোনো অসুবিধা হবে না। জয় শ্বশুর মশাইকে নতুন দলিলের কপিটা সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছে।

রবিবারে সকলে একটু দেরীতে ঘুম থেকে ওঠে। কলিং বেল বেজে উঠতে শান্তি নিজেই এল দরজা খুলতে। দরজা খুলেই অবাক, 'ওমা! তোমরা!' বাবা মা'কে দেখে শান্তি যেমন অবাক তেমনই খুশি। মার সঙ্গে রোজ ফোনে এবেলা ওবেলা মিলে প্রায় দুঘন্টা কথা হয়। কালও কথা হয়েছে। মা তো আসার কথা কিছু বলল না। মেয়ের মনের কথা সোমেশ্বর আঁচ করতে পারলেন। বললেন, 'কেমন চমকে দিলাম বল তোদের!' শুধু শান্তি নয়, সবাই চমকে গেছে। গলা পেয়ে নাতি নাতনি ছুটে এল 'দাদু! দাদু!' করে। ওদের আনন্দ সব থেকে বেশি। ওদের যে খেলার সঙ্গী এসে গেছে। জয়ও শ্বশুর শ্বাশুড়িকে দেখে খুশি হ'ল। তবে খুশির কারণ শুধু জয়ের হিসেবি মন জানল, বাইরের সবাই মুখে তৃপ্তির হাসি দেখল। কদিন আগে খবর এল কাজের মেয়েটার বাবা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। কাজের মেয়েটাকে ক'দিনের ছুটি আর কিছু টাকা দিয়ে দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। মহানুভবতা দেখাতে গিয়ে এ কদিন ঘরের নানা কাজে হাত লাগাতে হচ্ছে বলে জয়ের মন মেজাজ খিঁচড়ে ছিল। কাজে হাত লাগাবার লোক পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। সোমেশ্বর এমনই মানুষ। দু'দণ্ড শুধু বসে থাকা বা আরাম করা তার স্বভাবে নেই। কোনো না কোনো কাজ নিয়ে মেতে থাকেন। মেয়ের বাড়ি এলেও সেটা বদলায় না। তাই যখনই শুনলেন কাজের মেয়ে ছুটিতে বাড়ি গেছে হাসতে হাসতে মেয়ে কে বললেন, 'দেখলি তো তোর কষ্ট হচ্ছে বলে ভগবান কেমন আমাকে পাঠিয়ে দিল।' জয় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তার মানে! আপনি এখানে কাজ করবেন না কি? সে হবে না। বিশ্রাম করুন আর নাতি নাতনির সঙ্গে খেলা করুন।' মুখে এ কথা বললেও জয় চাইছিল তার কাজগুলো শ্বশুরমশাই করুক। আর তার মুখের কথা যে শ্বশুরমশাই শুনবেন না তাও সে ভালেমত জানে। সোমেশ্বর এত প্যাঁচ পয়জার বোঝার মানুষ নন। তাই তিনি জামাইয়ের প্রতি স্নেহের পরিমাণ আরো কিছুটা বাড়াতে কার্পণ্য করলেন না। বাইরের জামা কাপড় ছেড়ে বসে পরলেন যা সব এনেছেন তা সকলকে দেওয়ার জন্য।

দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে সোমেশ্বর বুঝতে পারছেন না। সকাল থেকে হাজারো কাজে তিনি ব্যস্ত। নাতি নাতনিকে স্কুলে দিয়ে আসার পথে বাজারটা সেরে আসা। ছুটির সময় স্কুল থেকে নিয়ে আসা। বিকালে ওদের নিয়ে পার্কে যাওয়া। এ সবই সোমেশ্বরের খুবই ভালো লাগার কাজ। জয়কে রোজই সকালে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। বাজার ছাড়্যাও টুকিটাকি নানা কাজ এসে পড়েছে সোমেশ্বরের ঘাড়ে। অবশ্য সোমেশ্বর ঘাড় পেতেই থাকেন সব সময়। শান্তিদের আবাসনের সকলের সাথেই তাঁর আলাপ হয়ে গেছে। এমন সদালাপী অমায়িক মানুষের সাথে কে আর না আলাপ করতে চায়। আবাসনের দুর্গাপুজোর এবার দশ বছর। তাই নানা রকম অনুষ্ঠান হবে। এখানে খুঁটি পুজোর চল নেই। বদলে মহালয়ার দিন

যাওয়ার সময় নাতি নাতনি দু'টো কিছুতে ছাড়ত চাইছিল না। বারবার একই প্রশ্ন, 'তুমি কেন চলে যাচ্ছ?' শান্তি ছেলেমেয়েদের টেনে আনে। বোঝায় দাদু একটা কাজে যাচ্ছে কাজ হয়ে গেলেই ফিরে আসবে। জয় নিজের বাইকে চাপিয়ে সোমেশ্বরকে স্টেশনে নিয়ে আসে। এক্সপ্রেস ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দেয়। সে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত যে সোমেশ্বর ঠিক তিনতলাটা বাঁচিয়ে দেবেন। কাউন্সিলার সোমেশ্বরের ছাত্র শোনার পর থেকে তার দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হয়েছে। একটু অপেক্ষা করতেই ট্রেন এসে গেল। সোমেশ্বরের সঙ্গে কোনো লাগেজ নেই। শুধু ঘরের চাবিটা অদিতি বেরোবার আগে মনে করে দিয়ে দিয়েছে। ট্রেনে তুলে দেওয়ার সময় জয় একটু গলা নামিয়ে বলে, 'আপনার ছাত্র যদি টাকার কথা বলে রাজি হয়ে যাবেন। টাকার ব্যবস্থা আমি করে নেব।' সোমেশ্বর ট্রেনে উঠে দেখলেন জানালার ধারে তার বসার জায়গা। কালো কাঁচে ঢাকা জানালা দিয়ে বাইরেটা এই পরন্ত বেলায় রাতের মতোই দেখাচ্ছে। হয়তো তার মনের আঁধারই তার চোখের আলোকে কমিয়ে দিয়েছে, তাই এত অন্ধকার। ট্রেন সোজা বর্ধমানে থামবে। তারপর হাওড়া। এর মাঝে আর কোথাও থামার নেই। ট্রেন ছাড়ার আগে জয় একটা জলের বোতল কিনে দিয়ে গেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে। কালো কাঁচে চোখ রেখে সোমেশ্বর দূরের ছোট ছোট আলোকবিন্দু গুলোকে দেখে চলেছে। বেশ লাগে চলন্ত ট্রেন থেকে এভাবে আলো দেখতে। আলেয়ার মতো তাকে যেন কোথাও হারিয়ে দিতে চাইছে। থামার কথা না থাকলেও ট্রেনটা এক জায়গায় হঠাৎ থেমে যায়। সোমেশ্বর উঠে যান দরজার কাছে। দরজাটা যেন তাঁর জন্যেই খুলে রাখা। অনামি স্টেশন, এত বড় ট্রেন সেখানে থামেনা কখনো। আজ ভুল করে হঠাৎই থেমে পরেছে।প্লাটফর্মের আলোতে জৌলুস নেই। সেই মরা আলোর টানে সোমেশ্বরপ্লাটফর্মে নেমে পরেন। জলের বোতলটা পাশে রেখে একটা ফাঁকা বেঞ্চে বসে পরেন। এরপর ট্রেনটা কখন চলে গেছে সোমেশ্বর খেয়াল করেন নি। খেয়াল হতে দেখলেন একটা পাগলা গোছের লোক ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। সোমেশ্বর উঠে দাঁড়াতেই সে হাত বাড়িয়ে কিছু চায়। সোমেশ্বর জলের পুরো বোতলটা তার হাতে দিয়ে রেল লাইন ধরে এগিয়ে গেলেন। পরদিন আবার একটা নতুন দিন শুরু হয়েছে। জয় ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে গেছে। কাজের মেয়েটা আজ সকালেই দেশ থেকে ফিরেছে। তাই শান্তি আবার আরাম করছে। অদিতি বিছানা ঝাড়তে গিয়ে সোমেশ্বরের খাতাটা মাথার বালিশের কাছে দেখতে পেল। খাতাটা বন্ধ হয়নি, ভেতরে কিছু আছে। তুলে দেখে বাড়ির চাবির গোছাটা। ওই পাতাতেই সাহিত্য সভায় পড়ার জন্য একটা লেখাও লিখে রেখে গেছেন সোমেশ্বর। ✿

চিঠির নামে

উষ্ণীষ গুহ

এখন রাত বাড়লেই, চৌরাস্তার মোড়, গোপন সংলাপ,
গরম ভাত, ঘি-এর গন্ধ, ডাস্টবিনে রক্তগোলাপ
আরশিতে নতুন একজোড়া চোখ, কাজল, সাজছে বেশ
ভাঙা ঘরদোর, বৃষ্টি-ভেজা কার্নিশ, দুপুর কখন শেষ
লাল রঙটা ভাল্লাগছেনা, কালোয় তোমায় মানায়,
সস্তা স্বপ্ন, পাশ বালিশ, ঘড়ি ঘুরছে, পুরোনো পাখায়
ঠাণ্ডা ঘরে শীত নামছে, বাস, পাশে ঘাম
দেড়খানা পা, বাকি অর্ধেক, হাসপাতাল ও আরাম
মিছিলের রাগী মুখ সব, লড়াই চলছে, কালো হাতটা গুঁড়ো,
দাবীর ঘরে হিসেব মিলছে, পকেট হাতড়ে ফুরোয়
চারখানা কাঁধ, নড়বড়ে খাট, রজনীগন্ধায় চমক,
ব্রিগেডে আজ মৌনতা, ছেঁড়া জামায় স্তাবক,
ফিরে এলে এবার চিঠি, জিপিও-টাই ভালো
পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব, অন্য ঘাড়ে, কেউ কেউ আলো
বাড়ির পাশে, আগাছা এক, তবু নতুন করে স্তব্ধ
ভালো থেকো, ভালো রেখো, খুঁজে নিও শব্দ ... ✿

ও অমৃতের সন্তান

সুস্মিতা রায়চৌধুরী

ওরা থাকে পথের কোনে, পুজোর মণ্ডপে
নোংরা নখ খোঁটে আনমনে
ঝলমলে ভিড়ের মাঝে ওদের লাগে বেমানান —
ওদের কপালে জোটে অনেক অসম্মান।
আদুর গা, অনাদরে বাঁচা
পুজোয় ওদের কেউ কাপড় দেয় না
মেলায় যায় ওরা, লুকিয়ে
ঐশ্বর্যের সামনে পাতে হাত
ধোপদুরস্ত কিছু লোক ওদের দেয় —
অভিশম্পাত ...
যদি শহরের আনাচ কানাচ ঘোরো, ওদের দেখা পাবে
কিছুটা অবজ্ঞায় হয়তো ওদের এড়িয়ে যাবে,
কেউ ঝরাবে ঝুটো মায়া
কেউবা বলবে ওরাই ঝুটো, তবু অবিশ্রান্ত ওদের কায়া !
বিদেশী আলোয় তিলোত্তমা বিজলী আলোই চান
ওরা থাকে এক কোনে, অমৃতের সন্তান। ✿

দ্বী পা ন্ত রে র ডা য়ে রী

কাবেরী রায়

সালটা ছিল ২০১২। আমরা পাঁচ বন্ধু সেপ্টেম্বর মাসে একদিন 'সাউথ সিটি মল'-এ দুপুরের খাবার খেতে খেতে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলি। অবশ্য এটা আমাদের পাঁচ কন্যের প্রথম বেড়াতে যাওয়া নয়, কাছেপিঠে যাওয়া তো লেগেই থাকে। এরকম ভাবেই আমরা মধ্যপ্রদেশ গিয়েছিলাম। আগেরবার জঙ্গল দেখা হয়েছে, এবার সবাই সমুদ্রে যেতে চাইছিলাম। আমি ছাড়া সকলেই হৈ হৈ করে উঠল 'চলো আন্দামান'। আন্দামান যাওয়ার কথা বলতেই আমি একটু না না করছিলাম তার কারণ হয় জাহাজ নয় উড়োজাহাজ চেপে সেখানে যেতে হবে। আর এই দুটোতেই আমার আতঙ্ক। কিন্তু এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হয় না, তাই ভয়কে সরিয়ে রেখে উড়োজাহাজেই সওয়ার হতে হ'ল। পাঁচজনে পাড়ি দিলাম দ্বীপান্তরে।

২৭ নভেম্বর। আমাদের ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটের ফ্লাইট। অত ভোরে পৌঁছানো যাবে না বলে আমরা ঠিক করলাম রাতে এয়ারপোর্টেই থাকবো। সেই মত ২৬ নঙেম্বর রাত আটটা নাগাদ একে একে সবাই জড়ো হলাম আমাদের গানের শিক্ষিকা সুমিতাদির মুদিয়ালির বাড়িতে। সবাই এসে যেতেই রওনা দিলাম। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম দমদম বিমানবন্দরে। সেখানে লাউঞ্জে বসে কফি আর গল্পে রাত কেটে ভোর। ৩টের সময় বোর্ডিঙের জন্য ভেতরে এলাম। চেকিং হয়ে যাওয়ার পর আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ার ভালোলাগাটাও সঙ্গে চাগাড় দিয়ে উঠল। ৫ টা ২০ মিনিটে 'এয়ার বাস'-এ করে প্লেনের কাছে এলাম। আমার জানালার ধারে সিট ছিল না, কিন্তু রূপাদি আমায় জানালার ধারে বসতে দিল।

প্লেন উড়ল পৌনে ছ'টায়। জানালা দিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছি কখনও মেঘের ভেতর ঢুকে যাচ্ছি আবার বেরিয়ে আসছি। কখনও উঠছি, কখনও নামছি। খুব ভালো লাগছে। প্লেন ছাড়ার একঘন্টা পর যখন 'ব্রেকফাস্ট' দিল তখন সবাই ঘুমোচ্ছে। বাইরের আবহাওয়া হঠাৎই খুব খারাপ হয়ে গেল। এয়ার-হোস্টেস ঘোষণা করলেন আমরা পোর্ট-ব্লেয়ারের কাছাকাছি এসে গেছি। প্লেন থেকে যখন নামলাম তখন ঘড়িতে সকাল পৌনে আটটা। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে প্লেনে চড়ে আন্দামানে পৌঁছে গেলাম। এখানে থাকার রিসর্ট ও যাতায়াতের গাড়ির ব্যবস্থা কলকাতা থেকেই করা ছিল। গাড়ির চালক পিটার তার নাম লেখা বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে খুঁজে নিতে তাই কোনো অসুবিধা হ'ল না। পিটারের গাড়িতে করে গেস্ট-হাউসে পৌঁছে গেলাম।

গেস্ট হাউসে এসে হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে সকাল ১০ টায় রওনা দিলাম 'চাথাম'-এ। সেখানে দেখলাম 'ফিসারিজ মিউজিয়াম', 'অ্যানথ্রোপলজিক্যাল মিউজিয়াম', 'মেরিন মিউজিয়াম', 'ফরেস্ট মিউজিয়াম' আর 'শ-মিল'। প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গেস্ট হাউসে ফিরলাম। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে পরলাম 'সেলুলার জেল' দেখতে। জেল ঘুরে দেখার সময় একটা মনখারাপের অনুভূতি হ'ল। কত অত্যাচার, কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এখানের ছোট ছোট খুপরি ঘরে বন্দী থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। ফাঁসির মঞ্চ, বন্দীদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হত তার মডেল দেখতে দেখতে ছোটবেলায় পড়া ইতিহাসকে চোখের সামনে জীবন্ত উপলব্ধি করলাম। সন্ধ্যের সময় 'লাইট এণ্ড সাউণ্ড' শো দেখলাম। গেস্ট হাউসে ফিরলাম যখন রাত প্রায় ৯ টা।

২৮ নভেম্বর। সকাল ৭টার সময় বেরিয়ে বড় লঞ্চে করে 'ব্যাম্বু ফ্ল্যাট' এলাম। বিকালে গেলাম 'চিড়িয়া টাপু'তে। এখান থেকে খুব ভালো সূর্যাস্ত দেখা যায়। কিন্তু বৃষ্টি বাধ সাধল, কিছুই দেখা হ'ল না।

২৯ নভেম্বর। সকাল ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ গেস্ট হাউস থেকে গাড়ি নিয়ে এলাম বাস-স্ট্যাণ্ডে। বাস ধরে পৌঁছালাম জেটিতে। সেখানে আমরা 'এম.ভি. ম্যাক রজ' জাহাজে উঠলাম। আবহাওয়া ঠিক ছিল না। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠায় জাহাজটা খুব দুলছিল। জাহাজের কেবিনের ভেতর একটা টিভিতে সিট-বেল্ট, লাইফ-জ্যাকেট ব্যবহারের পদ্ধতি দেখাচ্ছিল। আমাদের কফি আর বিস্কুট খেতে দিয়েছিল কিন্তু জাহাজের দুলুনিতে কাপ থেকে কফি ছলকে পরে যাচ্ছিল। জানালা দিয়ে দেখছি সমুদ্রের জল একেবারে কালো। এজন্যই একে 'কালাপানি' বলা হ'ত। জাহাজ 'হ্যাভলক' পৌঁছালো ১০ টা ২০ মিনিটে। এখানে ডলফিন রিসর্টে উঠেছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে স্নান করবো বলে গেলাম 'রাধানগর বিচ'-এ। ওখানেও বৃষ্টি পেলাম। বিকাল ৩টে ৩০ মিনিট নাগাদ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হ্যাভলকের হোটেলে ফিরলাম। সমুদ্রের ধারেই রিসর্ট, সন্ধ্যাবেলা আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসলাম।

৩০ নভেম্বর। সকালে করবীদি'র সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়ে অনেক ঝিনুক আর কোরাল কুড়িয়েছি। রিসর্টের চারিদিকে নারকেল গাছ। সমুদ্রের ঢেউ গাছের গায়ে এসে আছড়ে পরছে। বৃষ্টির জন্য 'এলিফ্যান্ট বিচ'-এ যাওয়া বাদ দিতে হ'ল। অগত্যা আবার রাধানগর বিচে। সমুদ্রে স্নান করে একটা ধাবায় খেলাম।

হ্যাভলকে দু'দিন থাকা হল কিন্তু বৃষ্টির জন্য আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ হ'ল না।

১ ডিসেম্বর। আজ পোর্ট-ব্লেয়ারে ফিরব। সকালের খাবার খেয়ে রিসর্টের চারপাশটা একটু ঘুরলাম। গাড়ি করে জেটিতে এলাম। 'শিপিং কর্পোরেশন'-এর জাহাজে করে ফেরা। আমাদের ড্রাইভার পিটার আগে থেকেই আমাদের জাহাজের টিকিট কেটে রেখেছিল। পিটার আন্দামানেরই বাসিন্দা। জাহাজে করে ফেরার সময় আমরা ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সমুদ্রে দু'টো ডলফিন দেখলাম। পোর্ট-ব্লেয়ারে পৌঁছালাম বেলা ১১টায়। পিটার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাজার ঘুরে গেস্ট-হাউসে ফিরলাম। বাজারে কয়েকটা কাজ সেরে নিতে হ'ল। কাকলী এ.টি.এম. থেকে টাকা তুলল, আমি ক্যামেরার দোকানে গেলাম ক্যামেরা ঠিক করতে। যে রেস্তোঁরায় বিরিয়ানি খেলাম তার মালিক কসবা বোসপুকুরের বাসিন্দা। কথায় কথায় জানলাম তিনি রান্নার জিনিসপত্র আনান কলকাতার নিউ-মার্কেট থেকে, প্লেনে করে। গেস্ট-হাউসে একটু বিশ্রাম করে আবার সেলুলার জেল দেখতে গেলাম। ফেরার পথে দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনলাম। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পরতে হ'ল, কাল 'বারাটাং কেভ' দেখতে যাওয়ার জন্য ভোর-রাতে উঠতে হবে।

২ ডিসেম্বর। রাত ২টো ৩০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠে পরলাম। একে একে সবাই স্নান করে চা খেয়ে ভোর ৪টে'র সময় বেরোলাম। পিটার সময়মত গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে। গাড়িতে করে গেলাম জেটিতে। আরো অনেক গাড়ির সঙ্গে আমাদের গাড়িটাও বার্জে তোলা হ'ল। আমরা গাড়িতে বসেই নদী পেরোলাম। আন্দামানে এসে নিজের জন্মদিনই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু বন্ধুরা কেউ ভোলেনি। গাড়িতেই আমার জন্মদিন পালন করল। কলকাতা থেকে কেক, কার্ড কিনে এনেছিল। এমন অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না। বেশ মজা লাগল। নদী পেরিয়ে জারোয়াদের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তাটা বিপজ্জনক বলে কনভয় নিয়ে একসাথে চল্লিশটি গাড়ি রওনা দিল। কিছুটা পথ যেতেই একজন জারোয়া পুরুষকে দেখলাম। হাতে বল্লম, গায়ে কাদার প্রলেপ। একটা ম্যাটাডোরে করে অনেকগুলো বাচ্চা জারোয়াকে কোথাও নিয়ে যেতে দেখলাম।

জঙ্গল পেরিয়ে জেটিতে এলাম। আবার গাড়ি সমেত বার্জে চড়তে হ'ল। 'জির কাটাং' জেটি থেকে 'বোট' চড়ে 'বারটাং-কেভ' দেখতে যেতে হয়। আমাদের সঙ্গে ড্রাইভার পিটার আর গাইড শ্রীকান্ত। 'বোট' চড়তে গিয়ে কাকলী'র জুতো পরে গেল সমুদ্রে, আর পাওয়া গেল না। বেচারিকে খালি পায়ে ঘুরতে হল। 'বোট' যখন ছাড়ল তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি। সবাই 'লাইফ জ্যাকেট' গায়ে আর ছাতা মাথায় দিয়ে চললাম। তবে ঝোড়ো হাওয়াতে ছাতা ধরে রাখা যাচ্ছিল না। অগত্যা ছাতা বন্ধ করে রেখে ভিজতে ভিজতেই যেতে হ'ল। আমাকে নিয়ে সবাই মজা করছে, ভয় দেখাচ্ছে। আরে অনেকগুলো বোট দেখলাম দূরে দূরে। সমুদ্রের তীরে ম্যানগ্রোভের বন। একসময় পৌঁছালাম বারাটাং কেভে। গুহার ভেতর টর্চ জ্বেলে আমাদের গাইড শ্রীকান্ত সব অদ্ভুত প্রাকৃতিক ভাস্কর্য্য দেখালো। বৃষ্টির জল জমে জমে এইসব ভাস্কর্য্যের সৃষ্টি। হাঁটা পথটা মোটেই ভালো ছিল না। কাদা আর জোঁকে ভরা রাস্তা দিয়ে আমাদের হেঁটে যেতে হ'ল। খুব সাবধানে 'বোট'-এ ফিরলাম। 'বোট' আমাদের পৌঁছে দিল বড়ো লঞ্চে। লঞ্চে চেপে আমরা এলাম 'উতরা' জেটিতে। সেখান থেকে 'রঙ্গত'। এখানে দুপুরের খাওয়া সেরে চললাম মায়া-বন্দরের উদ্দেশ্যে। পথে জঙ্গলের মধ্যে জারোয়াদের পাতা দিয়ে বানানো ঘর-বাড়ি দেখলাম। রাস্তাগুলো খুব পরিষ্কার, কোথাও প্লাস্টিকের চিহ্ন মাত্র নেই। বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ মায়া-বন্দরে পৌঁছালাম। শুভ্রাদি'র দাদা'র দৌলতে আমরা এখানের সব থেকে ভালো গেস্ট হাউসে থাকতে পারছি। আজ আর কোথাও বেড়ানো নয়।

৩ ডিসেম্বর। সকাল ৯টা নাগাদ ডিগ্লিপুর পৌঁছালাম। রাস্তাতেই জলখাবার সেরে নিয়েছি। জেটিতে বোট বুক করে উঠে পরলাম। লাইফ জ্যাকেট পরতে হ'ল। আজকের আবহাওয়া ভালো ছিল, রোদ ঝলমলে। সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে আমাদের বোট ছুটছে দু'পাশে জল ছিটিয়ে। আমরা সবাই ভিজে যাচ্ছি। সকলে মজা করছে, আমার মনে হচ্ছে কতক্ষণে নামব। অবশেষে 'রস এণ্ড স্মিথ আইল্যাণ্ড' এসে গেল। জলের কাছে গিয়ে দেখছি কত কোরাল। জলটা পান্না সবুজ রঙের। জলের মধ্যে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। দুটো দ্বীপের মাঝে একটা রাস্তা আছে যেটা জোয়ারে জলের তলায় চলে যায় আর ভাটার সময় জেগে ওঠে। ওখানে বাঁশের তৈরী ঘর ছিল, সেখানেই বসলাম। দোলনা চাপলাম। জলে নেমে অনেক ঝিনুক আর কোরাল কুড়োলাম। ফেরার সময় আশেপাশের দ্বীপগুলো দেখতে দেখতে ফিরছিলাম। একটা দ্বীপে অজস্র পাখি দেখলাম। এখন সমুদ্রের ঢেউটা অত প্রবল নয়। আসলে আমার ভয়টা এখন কেটে গেছে, তাই ভালো লাগছে। গেস্ট হাউসে ফিরে একটু বিশ্রাম আর খাওয়া-দাওয়ার পর গাইডের কাছে কচ্ছপের ডিম পারা আর কুমীরের কথা শুনে গেলাম কালিপুর বিচ। আমরা অবশ্য দুটোর কোনোটাই দেখতে পেলাম না।

৪ ডিসেম্বর। আজকেও ভোর রাতে উঠতে হ'ল। সবাই তৈরী হয়ে পিটারকে ফোন করতেই গাড়ি হাজির। ভোর পাঁচটায় গাড়ি ছাড়ল। ডিগ্লিপুর থেকে মায়াবন্দর হয়ে রঙ্গতে যখন এলাম তখন সাড়ে ৮ টা। একটু থেমে আবার ৯টার সময় চলতে শুরু করলাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আবার জারোয়াদের দেখলাম। এবার দেখলাম জারোয়া মেয়েদের। তাদের গায়ে সুতোর গয়না, কোমরেও সুতো আর পাতার সাজ। বাচ্চা কোলে করে তার

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। নিষেধ থাকলেও ট্যুরিস্টরা ওদের খাবার দেয়। সেই খাবারের আশায় তারা দাঁড়িয়ে। আমাদের আগের গাড়ি থেকে বিস্কুটের প্যাকেট ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে আর ওরা গাড়ির দিকে ছুটে আসছে। পিটার আমাদের কিছু দিতে নিষেধ করল। কিছুটা দূরে দু'টো জারোয়া ছেলে নারকেল ভেঙে খাচ্ছিল। সামনের গাড়ি থেকে কাউকে ছবি তুলতে দেখে একটা নারকেল ছুঁড়ে মারলো গাড়িটায়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্যামেরা লুকিয়ে ফেললাম। পিটারের কাছে শুনলাম এইসব জারোয়ারা তেমন হিংস্র নয়, আধুনিক সভ্য সমাজের সঙ্গে অভ্যস্ত। যারা হিংস্র তারা থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর অরণ্যে।

আমরা 'উতরা' জেটিতে এসে পৌঁছালাম সাড়ে ১০টা। বার্জে চেপে গাড়ি নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে 'জিরকাটাং' জেটিতে এলাম। সেখান থেকে কনভয় করে যাওয়া হবে দুপুর ৩টে নাগাদ। অনেকটা সময় ছিল তাই আমি সময় কাটাতে গান শুরু করলাম, একে একে সবাই গলা মেলাতে লাগল। আশেপাশে যারা ছিলেন তাদের কাছ থেকে গানের অনুরোধ আসতে লাগল। এবার ওঠার পালা। কনভয় চলতে শুরু করেছে। জঙ্গল পার হতে প্রায় এক ঘন্টা লাগল। গেস্ট হাউসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। প্রচণ্ড ক্লান্ত সবাই, কোনো রকমে পোষাক বদলে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পরলাম।

৫ ডিসেম্বর। সকাল বেলা চা খেয়েই বেরিয়ে পরলাম। প্রথমে গেলাম 'মহাত্মা গান্ধী মেরিন ন্যাশানাল পার্ক'। এই জাতীয় উদ্যানটির প্রধান সম্পদ হ'ল স্ফটিক স্বচ্ছ জলে প্রবাল ও নানা রকমের সামুদ্রিক প্রাণী। জায়গাটা গোলক ধাঁধাঁর মতো। এখানকার জেটি থেকেই প্রাকৃতিক অ্যাকোরিয়াম 'জলি বয়' যাওয়ার জন্য বোট ভাড়া করলাম। সমুদ্রের মাঝখানে বোট থামল। দড়ির সিঁড়ি দিয়ে ছোট বোটে নেমে এলাম। এই বোটগুলো ফাইবার গ্লাসের বলে জলের ভেতরের সব কিছু — কোরাল, রঙিন মাছ, অদ্ভুত সব সামুদ্রিক প্রাণী — দেখা যাচ্ছে। এভাবে বেশ অনেকক্ষণ সমুদ্রে ঘোরার পর আমরা সি-বীচে নামলাম। আমি, কাকলী আর শুভ্রাদি স্নান করলাম, সাঁতার কাটলাম। জলের নীচে নানা রঙের কোরাল আর ঝিনুক। দু'ঘন্টা জলে ছিলাম। করবীদি সাঁতার জানে না বলে পাড়েই বসে থাকল আর রূপাদি আমাদের ছবি তুলল। ওখানে 'স্কুবা ডাইভিং'-এরও ব্যবস্থা ছিল। 'লাঞ্চ প্যাকেট' সঙ্গেই ছিল বলে আমরা ওখানেই খেয়ে নিলাম।

বিকালে গেলাম 'রাবার প্ল্যান্ট' দেখতে। গাছ থেকে রাবার বার করা, রাবার তৈরী করা দেখলাম। লবঙ্গ ও গোলমরিচ গাছ দেখলাম। সবার জন্য মশলা কিনলাম। ফেরার পথে বাজারে পিটারের মেয়ের জন্য জামা আর গাইড শ্রীকান্তের জন্য ব্যাগ কিনে রাতের খাওয়া হ'ল কলকাতার ছেলে শৈবাল ব্যানার্জীর হোটেলে।

৬ ডিসেম্বর। আজ অনেকটা দেরি করে ঘুম থেকে উঠলাম। আজ শুধু 'রস আইল্যাণ্ড' যাবো। এখন নাম অবশ্য 'লক্ষ্মীবাঈ দ্বীপ'। সাড়ে ১০টায় বের হলাম। লঞ্চ একঘন্টা পর। সবাই ছবি তুললাম। এক সময় লঞ্চ এল, আমরা 'রস আইল্যাণ্ড ' পৌঁছালাম। নেমে দেখলাম প্রচুর হরিণ। আমি ওদের হাতে করে পাতা খাওয়ালাম। ব্রিটিশ স্থাপত্যের নানা চিহ্ন ছড়িয়ে আছে দ্বীপ জুড়ে। ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যেটুকু টিকে আছে।

কেনাকাটা সেরে আজ বাইরের হোটেলে দুপুরের খাওয়া হ'ল। প্রচণ্ড বৃষ্টি এসে গেল। কিন্তু সূর্যাস্ত দেখার জন্য ছাতা মাথায় দিয়ে গেলাম 'চিড়িয়া টাপু'তে। অপেক্ষা করতে করতে অন্ধকার নেমে এল কিন্তু পাখি, সূর্যাস্ত কোনোটাই দেখা হ'ল না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসার সময় একটানা ঘন্টা বাজার মতো শব্দ পেলাম। পরে জেনেছি ওটা ঘন্টা-পোকার শব্দ। আমাদের যেমন ঝিঁ ঝিঁ পোকা, ওখানে তেমন ঘন্টা পোকা। গেস্ট হাউসে ফেরার কিছুক্ষণ পর মি. নারায়ণন এলেন। ইনি শুভ্রাদি'র দাদার বন্ধু। আমাদের থাকা, বেড়ানোর সব ব্যবস্থা উনিই করে দিয়েছিলেন। একবার বাজার থেকেও ঘুরে এলাম। মাইসোর মিঠাই নামে একটা দারুণ মিষ্টি খেলাম। ফিরে গোছগাছ শুরু হল। কাল তো ফেরা।

৭ ডিসেম্বর। ১১টা দিন আন্দামানে কাটিয়ে এবার কলকাতায় ফেরার পালা। ভোরবেলা উঠে সবাই তৈরী। গাড়ি আসতে দেরী আছে বলে সকলে গেস্ট হাউসের ছাদে গিয়ে সূর্যোদয় দেখলাম। ভারি আশ্চর্য লাগল — আজ আন্দামানে সূর্যকে উঠতে দেখলাম আর ডুবতে দেখবো কলকাতায়। পিটার এল ঠিক ৬টায়। এযারপোর্টে আসার পথে শ্রীকান্ত গাড়িতে উঠে এল। আমাদের সঙ্গে কিছু কোরাল ছিল। পিটারের বন্ধু কৃষ্ণ আমাদের কোরাল নেবার অনুমতিপত্র করে এনে দিল। বোর্ডিংয়ের পর এক সময় আমাদের প্লেনের সময় ঘোষণা হল। প্লেনে উঠে সিটবেল্ট বেঁধে বসলাম। ঠিক সময়ে প্লেন ছাড়ল। কোলকাতায় পৌঁছালাম ১১টা নাগাদ। প্লেন থেকে নেমে মালপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার একই সঙ্গে আনন্দ আর মন খারাপের অনুভূতি হ'ল। এতদিন একসঙ্গে ছিলাম, একসাথে খুব আনন্দে দিনগুলো কাটিয়েছি। সমুদ্র, পাহাড়, দ্বীপ জঙ্গল নিয়ে আন্দামান ভ্রমণের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে দাদার সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম।

(লেখিকা একজন কৃতি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। কিংবদন্তী শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের সুযোগ্যা ছাত্রী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আজও সঙ্গীতের পাঠ নিচ্ছেন। লেখিকার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন করবী দাসশর্মা, শুভ্রা ব্যানার্জী, রূপা গুহঠাকুরতা, কাকলী চট্টোপাধ্যায়।)

এ ক মা ত্র দি দি

গুরুদাস পাল

বল মা, মা, ওই মা, তুই কি শুনতে পাসনা?
'না রে বাবা আমি এখন খাবো না।'
আমি জানিরে মা, হাঁড়িতে বেশি ভাত নাই
তাইতো তুই বলিসনি যে একটু আমি খাই —
এবার বলতো মা, দিদি কোথায় গেছে?
কি বললি? দিদি ভালোই আছে।
দিদি আমার ঘুমিয়ে আছে ওই নিমগাছের তলায়!
চলতো মা দেখে আসি কেমন তার আলয় -
'দূর বোকা! এমন কথা বলে নাকি রে!
থাক না এখন! তুই আগে ওঠ পাত ছেড়ে।'
না মা, আজ আমি তোর কোনো কথা শুনবো না
না হলে আমি আর কোনোদিন ভাত খাবো না।
'থাক না বাবা, চল দুইজনে ঘুমিয়ে পড়ি,
কাল মেলায় তোকে কিনে দেবো সুন্দর গাড়ি।
শুয়ে শুয়ে বলবো তোকে পক্ষিরাজের গল্প —'
তাহলে মা, দিদির ও কথা বলবে অল্প অল্প
সেদিন থেকে তুমি কেন মা দিদিকে না ডাকো,
দিদির কথা বললে, মুখ আড়াল করে রাখো
স্বপ্নেতে দেখি, যেন দিদি আমায় ডাকছে,
আমি ছুটে কাছে যেতেই, সে পালিয়ে ভাগছে।
সত্যি রে মা, দিদি নিম গাছের তলায়ই আছে,
স্বপ্নে দিদি একথাই বলছিল আমার কাছে,
'দিদি যে তোর হারিয়ে গেছে আর তো কোথাও নাই'
এ কথা বলিস নে মা, বুক যে ফেটে যায়।

'জেলার খবর সমীক্ষা'র গ্রাহক হন
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬০ টাকা
লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে। পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।
যোগাযোগ করুন —
সম্পাদকীয় দপ্তরে,
গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।
ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

তা র'ই জ ন্য

তপন কুমার ভৌমিক

ক্ষতি হচ্ছে অনেকের, তার'ই জন্য
কাজে কিছুতেই লাগেনা মন,
ফোন করি ...
সে কেবল তার'ই জন্য।
ছোট জামা, জিন্সের প্যান্টটা আজও .....।
সরু ফ্রেমের চশমাটা মোচর খেয়েছে,
ছেড়ে যায়নি এখনো সেলাই করা ব্যাগটা।
হাসি মলিন হয় না কখনও,
লোকে হয়তো পাগল ভাবতে পারে
তাহলে বলবো, পাগলামীটা তার'ই জন্য।
চটি জুতোয় নক্সা খুবই পছন্দের
গায়ে ডেনিমের গন্ধ, নক্সা পাঞ্জাবী
আর! কোঁকরানো চুলের কলপ;
সে কবল তার'ই জন্য।।

শা র দী য়া

বেলা ব্যানার্জী

শরৎ কালে শারদীয়া
দুর্গা দেবী আসে,
ছোট বড় সবাই মিলে।
আনন্দেতে ভাসে
সকাল সন্ধ্যে ঢাকের আওয়াজ
সাজরে তোরা সাজ
পুজোর মাঠে ছোট বড়
সব মেতেছে আজ।
দূর্গা দেবী মাঝখানে
দুই পাশে তার চেলা
কুলফি মালাই ফুচকা বেলুন
হরেক রকম মেলা।
চারদিনের এই আনন্দেতে
থাকব সবাই ভুলে
ভাবব না কেউ দশমীতে
দুর্গা যাবে চলে।

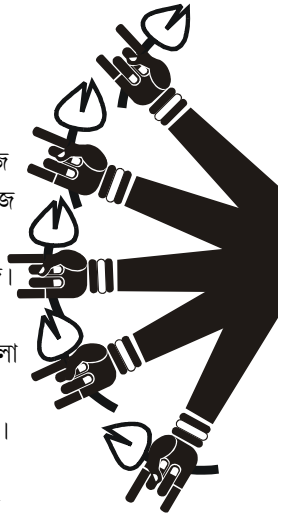

গ ল্পে র খোঁ জে

ইমন পাল

" Inovation distinguishes between a leader and a follower. " - Steve Jobs

সাহিত্য থেকে শুরু করে দৃঢ় তত্ত্বের বিজ্ঞান, সদাপরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ক্ষেত্র থেকে সমাজের বিস্তৃত প্রাঙ্গন সব ক্ষেত্রেই নতুনের খোঁজ চলে বলেই আজকের পৃথিবী এত অভিনব। সাংস্কৃতিক জগতে আবার নিত্যদিন এই নতুনের খোঁজটাই টিকে থাকার অমোঘ মন্ত্র। সেই নতুনের খোঁজ করতে গিয়েই হাজির হয়েছে 'অডিও স্টোরি' বিষয়টি। সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মা-ঠাকুমার মুখে গল্প, কথকের কথকতা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনে আসছে। আজকের আবহে সেই 'নস্টালজিক' মুগ্ধতার আবেশে নতুন করে সকলকে ভাসিয়ে দেওয়ার ভাবনা জাগে সদ্য কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখা তিন তরুণের — অয়ন, অভিজিৎ আর অপ্রতিম। তিনজনের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে তৈরী হল নতুন উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার আঁতুড়ঘর AAA Associates।

২০১৩ সালের ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় AAA Associates-এর প্রথম 'অডিও স্টোরি'। গল্পের নাম 'হিলওয়ে'র ঘটনা'। সময়ের দৈর্ঘে খুব বেশী না হলেও তাতে ছিল উপস্থাপনার সতেজতা আর গল্পের একেবারে ভিন্ন স্বাদের মিশেল। আর এই দুটি বৈশিষ্ট্যই হয়ে ওঠে AAA Associates-এর পরিচয়। স্বল্প পরিচিতির গণ্ডি ছাড়ানোর লক্ষ্যে Facebook-এ যোগ দেয় । এর মাধ্যমে তাদের একের পর এক গল্প প্রকাশ হচ্ছে আর শ্রোতার সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। অনুগামীর সংখ্যাবৃদ্ধি নতুন ভাবনায় ভাবায় তাদের। উপস্থাপনায় বৈচিত্র আনতে একজন পাঠকের বদলে এল একাধিক পাঠক। কিন্তু উপস্থাপনার থেকেও শ্রোতার কাছে সংস্থার মাপকাঠি হয়ে উঠেছে গল্পের উৎকর্ষ।

অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমূল পরিবর্তন এল গল্পের বিষয়বস্তু ও তার আনুষাঙ্গিক উপাদানগুলির মধ্যেও। এই পরিবর্তনের জন্যই সম্ভব হয়েছে 'উপলব্ধি', 'গীতবিতান' বা 'আত্মজ'র মতো গল্প রচনা। 'উপলব্ধি' গল্পে যেমন প্রকৃত ঈশ্বর দর্শনের গূঢ় জ্ঞানের উপলব্ধি হয় তেমনি 'গীতবিতান' গল্পে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা আধুনিক প্রেমিক যুগলের প্রেমের ইতিবৃত্ত হয়ে ওঠে। 'আত্মজ'তে শিক্ষা ও ভাষার গণ্ডি ছাপিয়ে দুটি মানুষের আত্মীয়তার যোগসূত্র গড়ে ওঠে। তারপর তৈরী হয়েছে আজকের পৃথিবীর গতিময় রূপ, বর্ণময় জীবনযাত্রা, জীবনের নানা ওঠাপরা নিয়ে 'Ultimate', আবার রোমাঞ্চ আর কঠিন বাস্তবকে মিলিয়ে দিয়ে 'Face of Death'-এর মতো গল্প। গল্পের রথ ছুটেছে আল্পসের চূড়া থেকে পুরুলিয়ার রুক্ষ প্রান্তরে, ভূতেদের চিড়িয়াখানা Îï [illegible] AAA Associates-এর গল্পের ডালি।

এই যাত্রাপথে শ্রোতাদের সঙ্গে তৈরী হয়েছে ভালোবাসা আর আত্মীয়তার এক অদৃশ্য সেতু। শ্রোতাদের কাছে সেরা আকর্ষণ প্রধান পাঠক অপ্রতীম ঘোষের পাঠ। তার পাঠ দক্ষতা ও উপস্থাপনের ভঙ্গিমা সকলকে মোহিত করেছে। গল্পের ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে শব্দের অলঙ্করণে সাজিয়ে তোলে অয়ন মুখার্জী আর অভিজিৎ হাজরা। আর আমার দায়িত্ব গল্পের Profing-এর। এখন অবশ্য AAA Associates-এর কর্মকাণ্ডে নানা বয়সের মানুষের মিশেলে এক অন্য পৃথিবী গড়ে উঠেছে। সেখানে প্রাপ্তি হয়েছে অনন্য সম্মান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে বিশেষ অভিমত। বিশিষ্ট বাচীক শিল্পী জগন্নাথ বসু 'আত্মজ' গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গল্পের মধ্যে একটা অথণ্ড জীবন্ত হয়ে ওঠে।' এমন আশীর্বাণী আমাদের প্রেরণা।

তবে আমরা শুধু 'অডিও স্টোরি'-এর পরিসরে আটকে নেই, বৃহত্তর ক্ষেত্রে ডানা মেলে কলকাতা মেট্রো রেলের জন্য 'Attitude Media'র সঙ্গে বিজ্ঞাপন তৈরীর দায়িত্ব পালন করেছি। এ পর্যন্ত পরে যদি মনে হয় আমরা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই কাজগুলো করছি তবে ভুল হবে। আমাদের সম্বল বলতে একটি মোবাইল ফোন। এবার নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন, এক একটা কাজ শেষ করে আমরাও কম অবাক হই না। মেট্রোরেলের কাজটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আমাদের পরিচিতি বাড়িয়েছে। এই রকমই এক পরিচিতি আমাদের Internet-এর জগতে ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করছে। আমাদের গল্প শোনা যাচ্ছে Bengali mp3.com-এ। সেই কারনে আমাদের শ্রোতার সংখ্যা হাজার থেকে বাড়তে বাড়তে ষাট হাজার ছাড়িয়েছে। ফলে Bengali mp3 তে আমরাই হয়ে উঠেছি প্রধান গল্প পরিবেশক।

সময় বদলাচ্ছে, আমাদের যাত্রাপথও বদলে যাচ্ছে। শুরুর দিন থেকেই প্রতিকূলতাকে সর্বক্ষণের সঙ্গী মেনেও বলতে পারি আমাদের এ পর্যন্ত সফর বিষাদগাথা হয়ে ওঠেনি, বরং তা আমাদের সুখের সাধন। আমাদের গল্পের চরিত্ররাই আমাদের আনন্দ সঙ্গী হয়ে উঠেছে। এমনই এক চরিত্র 'অরিন্দম', যে কখনও প্রধান, কখনও পার্শ্ব চরিত্রে হাজির হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গল্পে। এই চরিত্ররাই আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অটুট রেখে নিয়ে চলেছে কাঙ্খিত লক্ষ্যে।

ত্র স রে ণু

জহর চট্টোপাধ্যায়

বাস ছুটে চলেছে পিচ রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটা চওড়া হলেও পিচ দেওয়া অংশটা বিশেষ চওড়া নয়। দুপাশে লাল মোরামের অনেকটা পথ। লোকজন সে পথে গরু ভেড়া সঙ্গে নিয়ে হেঁটে যায়। অন্যদিক থেকে কোনো গাড়ি এসে গেলে দু'টোকেই মোরামের রাস্তার দিকে সরে যেতে হয়। এ রাস্তায় বাস খুবই কম চলে। এখন লরি চলছে বেশী। অনেকগুলো চালকল হয়েছে এ তল্লাটে। আরো কয়েকটা কারখানা তৈরী হচ্ছে। চাষবাসে এখন তেমন লাভ নেই, আবার পড়া লেখা শিখে অনেকেই গ্রামে চাষের কাজ করতে চায়না বলে জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। একটা থার্মাল প্ল্যান্ট তৈরী শুরু হওয়াতে গাড়ি যাতায়াতের সংখ্যাটা ইদানিং বেড়েছে। গাড়ি রাস্তা থেকে মোরামে নামলেই লাল ধুলো ওড়ে। সে ধুলোর গন্ধটা অন্যরকম। চেনার মাটির গন্ধটা নাকে আসতেই সম্বিৎ ফেরে পর্ণার। দেখে কণ্ডাক্টার সামনে দাঁড়িয়ে, টিকিট চাইছে — 'দিদি কোথায় নামবেন?' এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই পর্ণার। জায়গাটার নাম মনে নেই, শুধু একটা স্মৃতি মাথায় করে বেরিয়ে পড়েছে। বাসের সকলে তার দিকে তাকিয়ে। দেহাতি মানুষজন কেউ মাঠ থেকে, কেউ হাট থেকে ফিরছে। তাদের গন্তব্য বাঁধাধরা। তাই শহর থেকে আসা মেয়েটা কোথায় যাবে না জেনেই বাসে উঠে পরেছে ভেবে সবাই খুব অবাক।

কণ্ডাক্টার বলল, 'আপনি ঠিক বাসে উঠেছেন তো! আপনি যেখানে যেতে চাইছেন সেখানে আমার বাস যায়!'

— 'হ্যাঁ, এই রুটের বাসেই গিয়েছিলাম।'

— 'তাহলে টিকিটটা ক'ত টাকার কাটব?'

— 'তুমি এক কাজ কর, আমাকে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার একটা টিকিট দাও। আমি তো জানালার ধারে বসে আছি, যদি চিনতে পারি, সেখানে নেমে পরব।'

গ্রাম্য সরলতা আর সততা মাখা মুখ কণ্ডাক্টারের। খুব বেশী বয়স নয়। গোঁফের রেখাটা সবে স্পষ্ট হয়েছে। বলল, 'না থাক! আমি না হয় আপনার নামার সময় টিকিটটা কেটে নেব।'

পর্ণা কোলের ওপর রাখা ব্যাগটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে।' মুখ তুলতেই দেখলো সারা বাসের লোক তার দিকেই তাকিয়ে। খুব বিব্রত লাগছিল। এই ভেবে রাগও হচ্ছিল যে সকলের জানার কি দরকার সে কেথায় যাবে না যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার ভুল ভেঙ্গে গেল। বুঝল বাসের সকলে এক মানবিক আতিথেয়তা পালন করতে চাইছে তাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে। এযেন তাদের দায়। তাদের বাসভূমিতে আসা এক পথহারা পথিককে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ থেকেই হাজারো প্রশ্ন করছে তারা। সকলের প্রশ্নের জবাব দিতে পর্ণা বলল, 'আমার কথার সবটা না শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন না আমি কোথায় যেতে চাইছি। আপনারা যখন এই অঞ্চলে থাকেন আর অনেকদিনের বাসিন্দা তখন আপনারাই হয়ত পারবেন আমার বন্ধুর কাছে পৌঁছে দিতে। আসলে অনেক বছর আগে যায়গাটায় গিয়েছিলাম। বোলপুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসে উঠেছিলাম। বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল আলুকাকা। আমাদের চাষের কাজ তদারক করত। আসল নাম আলি, আমি ছোট থেকে ঐ নামেই ডাকতাম। খুব ভালোবাসতো আমায়। আমিতো অনেক বড় বয়স পর্যন্ত আলুকাকাকে নিজের কাকা বলেই জানতাম।' পর্ণা বুঝল পুরনো কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছে। আসল কথাটা ওদের জানাতে হবে আর সংক্ষেপে। নিজেকে সামলে নিয়ে পর্ণা বলল, 'আলু কাকার কাছ থেকে যে জেনে নেব সে উপায়ও নেই। কাকা মারা গেছেন অনেকদিন। আর আমিও ভুলে গিয়েছিলাম আবিদাকে। ও আমার ছোটবেলার বন্ধু। খুব অল্প বয়সে ওর বিয়ে হয়ে যায়। ও শ্বশুরবাড়ি চলে গেল আর আমি ঘরের ভেতর কেঁদে ভাসাচ্ছি। আমি মাকে আবিদার শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যেতে বলতেই মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মাকে দেখে বুঝলাম আমি যে আবিদার কাছে যাই মা চাইছেন না। আমাকে আবিদার বিয়েতেও যেতে দেয় নি। আবিদা খুব কবিতা ভালোবাসত। আমার দাদুর ঘরে প্রচুর বই ছিল। পুরনো বসুমতি, শনিবারের চিঠি ছিল। আবিদাকে আমি দাদুর ঘর থেকে লুকিয়ে বই এনে দিতাম। ও খুব খুশি হত। সব বই পড়ে ফেলতো। ও আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়লেও বয়সে আমার থেকে বড় ছিল। তাই আমার থেকে অনেককিছুই ভালো বুঝতো। একদিন খুব আগ্রহ নিয়ে ওর একটা খাতা আমায় দিল। খুলে দেখি তাতে পাতার পর পাতা কবিতা লেখা। হাতের লেখাটা ছিল আবিদার মুক্তোর মত। মনে হল খাতা নয়, যেন ছাপা বই দেখছি। আমি তো অবাক। এত সব আবিদা লিখেছে, তাও আবার কবিতা। আমি অবাক হয়েছি দেখে আবিদা বলল আরও দুটো খাতা ও কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছে। আমি খাতাটা বাড়ি নিয়ে গেলাম পড়বো বলে। পড়ার বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে আবিদার খাতাটা পরছিলাম। সব বুঝতে না পারলেও পড়তে ভালো লাগছিল। কবিতাগুলো সবই কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা, কারোর প্রতি নিজের অনুভূতি যেন উজার করে দিয়েছে আবিদা। পড়তে পড়তে খেয়ালই করিনি কখন মা এসে পরেছে। খাতাটা আমার কাছ থেকে মা একরকম ছিনিয়েই নিয়ে নিল। বুঝলাম একটা অশান্তি হবে। মা খাতাটা নিয়ে বাবাকে দেয়। বাবা এসে

ধমক দিয়ে বললেন আমি যেন অবিদার সঙ্গে না মিশি। বাবা খাতাটা আবিদার বাবাকে দিয়ে এসেছিলেন। তার পর আর আবিদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। আবিদাকে আর স্কুলেও আসতে দেখিনি। কদিন বাদে আলুকাকা বলল আবিদার বিয়ে হবে। বিয়ে মানে তো শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে, আর দেখা হবে না, ভাবতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে আলুকাকাই আমাকে আবিদার শ্বশুর বাড়ির গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। আবিদা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো, আমিও কেঁদে ফেললাম। চলে আসার সময় আবিদা বলল আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না। আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে চাইছিলাম না। তাই বললাম আমি কলকাতায় পড়তে যাচ্ছি। পড়া শেষ হলেই তোর কাছে আসব। তখন তো কেউ কিছু বলতে পারবে না। আবিদা বলল ও আমার জন্যে অপেক্ষা করবে কিন্তু আমি যদি ওর ঠিকানা ভুলে যাই। তখন বলেছিলাম ভুলব না, কিন্তু এখন সত্যি ভুলে গেছি। শুধু এই বাসরুটটা আর সেখানের একটা অদ্ভুত বটগাছ ছাড়া কিচ্ছু মনে নেই। বাস থেকে নেমে একটা পায়ে হাঁটা পথ ধরে একটু যেতেই একটা ঢিবির ওপর তালগাছ আর তাকে জড়িয়ে বড় বটগাছ ছিল। বটের শেকড়গুলো ঢিবিটাকে জড়িয়ে সিঁড়ির মতো ধাপ হয়ে গেছে। ওটা পীরের থান বলে আলুকাকা প্রণাম করতে বলেছিল। এইটুকু স্মৃতি নিয়ে বেরিয়ে পরেছি। জানিনা, আবিদা'র কাছে পৌঁছাতে পারব কিনা।'

বাসের সকলে খুব আগ্রহ ভরে পর্ণার কথা শুনছিল। পাশে বসা একজন বয়স্ক মহিলা বললেন, 'এমন গাছ তো আমাদের রাজি মুকুল গাঁয়ে আছে।' নামটা পর্ণা প্রথম শুনলো। অবাক হয়ে বলে, 'রাজি মুকুল!' একটা বছর কুড়ির মেয়ে এগিয়ে এসে পর্ণাকে বলল, 'আসলে গাঁয়ের লোকজন নিজেদের ভাষায় ওই নামে ডাকে। আসল নাম কিন্তু আর্জিমহল।' এই নামটা কেন যে পর্ণার চেনা চেনা লাগছে মনে করতে পারল না। মেয়েটি কলেজে পড়ে। বলল, 'ম্যাডাম, আপনার কথা আমি শুনেছি। আমার বাড়ি আর্জিমহলেই। আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুর একটা সন্ধান আমি দিতে পারব। আর যদি না পারি তাহলে আমাদের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে নিতে পারবেন।' মেয়েটার মুখটা খুব চেনা লাগছে, তার কথাতেও খুব আন্তরিকতা। পর্ণা ওর সাথে যেতে রাজি হয়ে যায়। এবার কণ্ডাক্টারকে ডেকে দু'টো টিকিট কাটল।

বাস থেকে নেমে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর সেই বটগাছটার দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু পর্ণা তার মাথার ভেতরে গেঁথে থাকা ছবিটা এই বটগাছটারই কিনা তা ঠাহর করতে পারল না। মেয়েটির সাথে যেতে যেতে বারবার পিছু ফিরে দেখছিল কিছু মনে পরে কিনা। একসময় মেয়েটির বাড়িতে পৌঁছায়। সারা রাস্তা মেয়েটি কত কথাই বলে গেছে পর্ণা সে সব কিছুই শুনতে পায় নি। খুব চেষ্টা করছিল আবিদার মুখটার সঙ্গে মেয়েটার মুখটা মেলাতে। মিল যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু সেটা কি আশার কারণ, নাকি অনেকের সঙ্গে অনেকের যেমন মুখের মিল খুঁজে পাওয়া যায় এ তেমনই। যে বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে তার মেয়েই তাকে পথ দেখিয়ে বন্ধুর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এমন ঘটনা সিনেমা থিয়েটারে হতে পারে, বাস্তবে কি সম্ভব! পর্ণা ভাবে কেন এসব আবোল তাবোল কথা মনে করছে। দেখাই যাক না কি হয়। মেয়েটি পর্ণাকে বাইরে রেখেই ছুটে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল, সেই রকম প্রায় ছুটতে ছুটতে একজন মাঝবয়েসি মহিলাকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। পর্ণাকে দেখে থমকে গেলেন। তারপর অস্ফুটে বললেন, 'তুই ঠিক এলি তাহলে!' পর্ণার কান পর্যন্ত সে স্বর পৌঁছাল না। মাঝবয়েসি মহিলাটির চোখ এবার ছলছল করে উঠল, 'কি রে! বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবি, ভেতরে আসবি না!' পর্ণা কিছু না বলে এগিয়ে গেল। 'আমি তোর সেই আবিদা কিনা সন্দেহ করছিস?' পর্ণার স্মৃতিতে আবিদার যে ছবি তার সঙ্গে বাস্তবের আবিদার যে এত ফারাক হবে তার ধারণা ছিল না। তাছাড়া এতদিন ধরে যার কাছে যাবে বলে তৈরী হচ্ছিল, বিস্তর অসুবিধা পোয়াতে হবে বলে ধরে নিয়েছিল, তাকে এত সহজে পেয়ে যাওয়ায় পর্ণার এবার নিজের ওপরই রাগ হ'ল। তাহলে এত দেরি করল কেন সে, আরো আগে তো খোঁজ নিতে পারত। সত্যি বলতে পর্ণার স্মৃতির অতলে আবিদা তলিয়ে গিয়েছিল। কর্মসূত্রে পর্ণা এখন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে। মানবসম্পদ দফতর থেকে গ্রামীণ মহিলাদের সাহিত্যচর্চা বিষয়ে একটি প্রকল্পের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তাব আসে পর্ণার কাছে। এই কাজের সূত্রেই একদিন কথায় কথায় আবিদার কথা মনে পড়ে পর্ণার। তারপর খোঁজ খবর করতে করতে আজ একেবারে আবিদার সামনে। কিন্তু আবিদার যে আর সাহিত্যের সঙ্গে কোনো যোগ নেই তা বেশ বুঝে গেল পর্ণা। হতাশাটা সেই কারণে আরো বেশি।

ছোট মেয়েটি ভিতর থেকে জল আর দু'টো নারকেল নাড়ু নিয়ে এল। জলটা খেয়ে একটু স্বস্তি বোধ হল। মহিলা বললেন, 'আমায় তোর আবিদা বলে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে না রে!' পর্ণা চিরদিনই স্পষ্টভাষী এবং সত্যবাদী। তাই যা মনে হচ্ছে তা অকপটে বলে ফেলল। শুনে মহিলাটি বললেন, 'তুই তো একটুও বদলাসনি রে পর্ণা!'

— 'তাহলে তুই কেন বদলে গেলি?'

— 'আমি কি নিজের ইচ্ছায় বদলেছি রে! আমার ইচ্ছাই তো কেউ কোনদিন জানতে চায় নি। বিয়ের পর পরই উনি অসুখে পড়লেন। সেবা শুশ্রূষা করেও ধরে রাখতে পারলাম না। টাকা পয়সা, সম্পত্তি সব অসুখে খেলো। তিনটে মেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে আমি কি করে আর নিজেকে না বদলে থাকতে পারি।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবিদা চুপ

করে গেল।

— 'আমি তোর সাথে দেখা করতে এসেছি কিন্তু তোর জন্য নয়, তোর লেখাগুলোর জন্য।'

— 'সে সব কবে চুকেবুকে গেছে।'

— 'চুকেবুকে গেছে মানে? অত সুন্দর তোর লেখাগুলো, কোথায় গেল?'

— 'তুই কি ভাবছিস সেগুলো আমি সব বুকে করে নিয়ে বসে আছি।'

— 'তোর অত সুন্দর কবিতার খাতাগুলো কোথায়?'

— 'যে কবিতা লেখার জন্য আমাকে শাস্তি দিতে বুড়ো বরের সাথে বিয়ে দেওয়া হল, সেই কবিতার খাতা তারা আস্ত রাখবে ভাবছিস।'

— 'আমি তো এত কিছু জানতাম না, আমায় বলিস নি তো!'

— 'কি করে বলতাম? কোন কথা বলার উপায় ছিল? - ওসমানকে মনে আছে তোর? ওসমান সিদ্দিকি?'

— ' ওসমান সিদ্দিকি - কবি ওসমান সিদ্দিকি! - যিনি এবার সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেলেন?'

— 'ওসমান পুরস্কার পেয়েছে! - সে তো পাবেই! আমার কবিতা লেখার শুরু ওই ওসমানের জন্য। ওসমানই আমাকে উৎসাহ দিত। তখন তো আমি আরবি, ফার্সি কিছুই বুঝি না। ওসমানই আমাকে পড়ে শোনাত, বাংলায় বুঝিয়ে দিত। তারপর কখন যে ওসমানের কথা ভেবে কবিতা লিখতে শুরু করেছি নিজেও জানি না।'

— 'তুই তো বলেছিলি তোর কবিতার বই ছাপা হবে - সুন্দর সুন্দর সব নাম দিয়েছিলি বইগুলোর।'

— 'আতিয়া, আয়াত, আয়রা - সব আরবি নাম - ওসমানের দেওয়া।'

— 'তোর আফশোস হয় না!'

— 'কিসের আফশোস!'

— 'এই যে নিজের বই হবে বলে সুন্দর করে কবিতা লিখলি, নাম দিলি কিন্তু তারা কেউ ভূমিষ্ঠ হল না - জঠরেই মরে গেল জন্ম যন্ত্রণা নিয়ে -'

— 'ওরা প্রত্যেকে জন্মেছে - এই পৃথিবীর জল হাওয়ায় বেঁচে রয়েছে - আমি তো ওদের নিয়েই বেঁচে আছি। রোজ দেখছি - যত্ন করছি - সাধ্যমত সুখে রাখার চেষ্টা করছি।'

— 'কার কথা বলছিস তুই?'

— 'কেন আতিয়া, আয়াত, আয়রার।'

— 'কী বলছিস বলতো?'

— 'আতিয়াকে তো দেখলি - আমার বড় মেয়ে, তোকে আমার কাছে নিয়ে এল। আয়াত আর আয়রা স্কুল থেকে এই এল বলে।'

পর্ণা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে আবিদার দিকে। আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যাতে থাকে আবিদার মুখ। আবিদাকে যেন নতুন করে খুঁজে পেল পর্ণা। নিজের প্রাণের জিনিসকে কিভাবে আগলে রেখেছে। সত্যিই তো বড় বেশী জীবন্ত তারা বইয়ের থেকে। প্রতিদিন এক একটি কবিতা লিখছে আবিদা তার বইয়ের পাতায়। চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তেই আবার আবিদার মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

— 'ওসমানের সঙ্গে আর দেখা হয়েছে।'

— 'ওসমান যোগাযোগ রাখতে চেয়েছিল - আমিই মানা করেছিলাম। আতিয়া যখন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করল তখন আমি যোগাযোগ করেছিলাম - কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে গিয়েছিল। নিজে এসে মেয়েকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিয়ে যায়। একরকম জোর করেই ওর পড়ার সব খরচ খরচার দায়িত্ব নিল। পুরস্কারের কথাটা জানতাম না। বলবে হয়তো! আমার তো আর ফোন নেই। এখনকার যুগেও ঐ চিঠিই আমার ভরসা।'

— 'তোর মেয়েতো তাহলে আমায় চেনে - কই একবারও বললো না তো!'

— 'বলেনি! ওটা ঠিক আমারই মতো! নিজের কিচ্ছুটি কাউকে জানতে দেয় না।'

আতিয়া ঘরে ঢোকে থালায় করে খাবার নিয়ে। 'ম্যাডাম, এগুলো সব আপনাকে খেতে হবে। আমি নিজে হাতে বানিয়েছি।'

— 'ও রে মেয়ে! আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে চুপি চুপি এই সব হচ্ছিল। পাটিসাপটা বানিয়েছ! কী করে জানলে এটা আমার খুব প্রিয়।' পর্ণা খুব আশ্চর্য হয়ে আবিদার দিকে তাকায়।

— 'তোর কথা ও সব জানে। তোর পছন্দ, অপছন্দ। আমার কাছেই শুনেছে। প্রথম যেদিন কলেজ থেকে এসে ও আমায় তোর নাম বলে, আমি একবার ভেবেছিলাম ওকে বলি আমার নাম বলে তোর সাথে যোগাযোগ করতে।'

পর্ণা একটা পাটিসাপটায় কামড় দিয়ে বলে, 'অপূর্ব হয়েছে।' আবিদাকে চুপ থাকতে দেখে বলে 'কি রে বলিস নি কেন!'

— 'লজ্জায় বলিনি! তুই যদি আমায় না চিনতে পারিস? মেয়েটার কাছে তো মুখ দেখাতে পারতাম না।'

— 'এখন কি মনে হচ্ছে? মুখ দেখাতে পারবি!'

আবিদা ওড়না দিয়ে চোখ মোছে, কিছু না বলে মাথা নাড়ে। পাটিসাপটা শেষ করে রেকাবিটা আতিয়ার হাতে দিয়ে টয়লেটে যেতে চায়। আতিয়া খুব ব্যস্ত হয়ে পর্ণাকে ভেতরে নিয়ে যায়।

আবিদা নিজের ঘরে গিয়ে একটা পুরনো ট্রাঙ্ক বার করে মেঝের উপর রাখে। ঘুলঘুলি দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। পর্ণা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে আবিদা বাক্সটা খোলার চেষ্টা করছে। বহু বছর পুরনো স্মৃতিগুলো জবরদস্তি বন্দি হয়ে আছে তার মধ্যে। বাক্স খুলতেই একরাশ ধূলিকণা উড়ে গেল আলোর দিকে। আবিদার হাতে কয়েকটা লালচে হয়ে যাওয়া পাতা। মুক্তোর মতো অক্ষরগুলো সব একে একে মুক্তির আনন্দে ভেসে উঠতে থাকে। পর্ণা দেখতে পায় ধূলিকণাদের সাথে আলোয় মিশে যাচ্ছে আবিদার লেখা।

জেলার খবর সমীক্ষা'র

শারদীয়া

ছোটদের পাতা

কবিতার পাতা ঃ

ছো ট্ট পা খি

শ্রেয়া সিনহা (পঞ্চম শ্রেণী)

যখন আমি ঘুম থেকে উঠি,
জানালা দিয়ে মারি উঁকিঝুঁকি,
ছোট্ট পাখিটি ঠিক জানালার দিকে
'সুপ্রভাত' বলতো যেন মিষ্টি সুরে ডেকে।
যখন আমি ইস্কুল থেকে ফিরি,
আমার পাশে উড়ে উড়ে করত ঘোরাঘুরি।
সকাল সন্ধ্যে সবসময় সে থাকত পাশে,
বন্ধু হয়ে ছিল আমার মনের খুব কাছে।
একটা দিনও না পেলে তার দেখা,
লাগত আমার খুবই ফাঁকা ফাঁকা।
বড় হতেই একদিন সে চলে গেল নিজে,
কোথাও একটা বাসা নিতে খুঁজে।
তার সাথেই খুশি আমার গেল হারিয়ে,
চলে গেল সে আমায় ভীষণ কাঁদিয়ে।
ভুলে গেছে সে আমায়, ভুলিনি আমি তাকে,
যেখানে সে আছে যেন আপন সুখেই থাকে ।

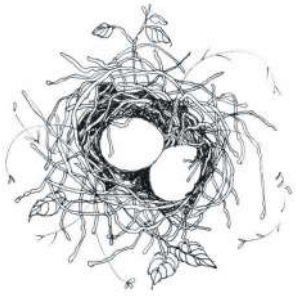

শা র দী য়া

আশিষ কুমার গুপ্তা (পঞ্চম শ্রেণী)

বলি কি ভাই আসছে আবার শারদীয়া পুজো,
ভালো ভালো পোষাকগুলো এখন থেকেই খোঁজো।
এক দোকানে না পেলে ভাই অন্য দোকান যাবে,
কেনাকাটার পর্ব শেষে রেস্তোঁরাতে খাবে।
বর্ষা গেল, শরৎ এল, পাচ্ছি পুজোর গন্ধ,
ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাব স্কুলটা হলেই বন্ধ।
আকাশ দেখায় মেঘের খেলা, ফুটছে কাশের ফুল,
জুঁই করবী হাসনুহানা শিউলি দোদুল দুল।
পুজোর কদিন দেদার মজা, নতুন জামা জুতো,
ঘুরবো ফিরবো ঠাকুর দেখবো খাবো ইচ্ছে মতো।
ষষ্ঠি'র দিন কাছে পিঠে, সপ্তমী সারা রাত,
অষ্টমীতে ঠাকুর দেখে সবাই কুপোকাৎ।
নবমীতে কেমন যেন বুক করে দুরুদুরু,
ঠাকুর গেলেই আবার হবে একঘেঁয়ে দিন শুরু।
'আসছে বছর আবার হবে' বলব সবাই মিলে —
দু'চোখ আমার ভরে যাবে শারদীয়ার জলে।

ব দ মা শ ছে লে

সাত্বত মুখোপাধ্যায় (পঞ্চম শ্রেণী)

আছে এক বদমাশ ছেলে,
খেতে ভালোবাসে মাছ 'গুলে',
লেখাপড়া ফেলে সে খেলে,
পড়তে বসেই শুধু ঢোলে,
স্কুলে তার ঘুম আসে,
বাংলা ভাষার ক্লাসে,
অঙ্কের পিরিয়ডে সব গোলমাল,
যোগকে বিয়োগ করে, হয় ভুলভাল।

ও মা দু গ্গা

জহর চট্টোপাধ্যায়

ও মা দুগ্গা! তোমার দশটা কেন হাত?
কোন হাতেতে কলম ধরো, কোন হাতে খাও ভাত?
স্নানের পরে কোন হাত দিয়ে চিরুনি বোলাও চুলে?
কোন হাতে কী করতে হবে যাও না কি গো ভুলে?
সবাই বলে জন্ম মৃত্যু বাঁধা তোমার হাতে,
সুখ দুঃখ তুমিই লেখ মোদেরই বরাতে।
বিপদ থেকে রক্ষা পেতেও তোমারই হাত থাকে
জোড় হাতে তাই সবাই তোমায় 'দুর্গা' বলে ডাকে।
যতই দিন যাচ্ছে মা গো বিপদ বাধা বাড়ছে,
রক্ষা করতে বললে তোমার হাত কি কম পড়ছে?
দু'হাত দিয়েই অনেক মানুষ করে দশের কাজ,
হাত থাকতেও অনেক লোকের শুধুই অকাজ।
আপন হাত কে ভাবে তারা ঠাকুর জগন্নাথ,
তাদের কাজেই ভুগছে মানুষ, দিচ্ছে মাথায় হাত।
পয়সা টাকা ওদের কাছে অনাথ পিতৃহারা,
তাদের হাতেই গরিব মানুষ হচ্ছে সর্বহারা,
এত দেখেও কেন মা গো গুটিয়ে রাখ হাত?
দশ হাত দিয়ে কর তাদের দেশ থেকে উৎখাত।
না যদি পার বুঝতে এসব কোন হাত দিয়ে করবে,
সবাই তোমায় আড়ি দেব, একা একাই থাকবে।

তা রা চু রি

সপ্তাশ্ব ভৌমিক

রঙ মেখে সঙ সেজে বেপাড়ার গুপী
আকাশের তারা গোনে রাতে চুপি চুপি।
মাঝরাতে মাথা ঘোরে বলে, 'থুড়ি থুড়ি
কিছু তারা মনে হয় হয়ে গেছে চুরি।'
এই শুনে ও পাড়ার হারু খুড়ো বলে,
'সব তারা ভেসে থাকে পুকুরের জলে।
কিছু তারা মাঝ রাতে গিলে ফেলে মাছ,
পাড় থেকে দেখেছিল ডুমুরের গাছ।
সেই গাছে বাসা করে ছিল টুনটুনি,'
খুড়ো বলে, 'তার থেকে সবকিছু শুনি।'
গুপী বলে, 'মাছ গেলে আকাশের তারা —
এমন পাগল নিয়ে যায় না তো পারা।
অকারণে হারু খুড়ো কেন মারে গুল?
চাঁদ চুরি করে তারা এতে নেই ভুল।'
খোকা বলে, 'সূর্য-টা আরো বড় চোর
সব তারা উবে যায় যেই হয় ভোর।'

বিড়াল আর পানকৌড়ি

শুভশ্রী নন্দী (ষষ্ঠ শ্রেণী)

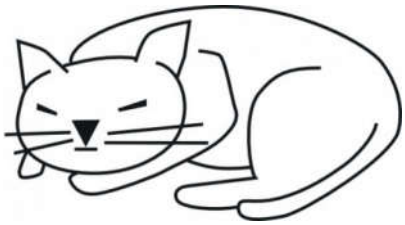

একটা বিড়াল আর পানকৌড়ির দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল। তাদের দুজনেরই রং ছিল কালো। তারা থাকতোও একই বটগাছে। বিড়ালটা থাকতো বড় দীঘির পাড়ের বুড়ো বটগাছের গোড়ার একটা কোটরে, আর পানকৌড়ি থাকতো ঐ গাছেরই উপরের দিকের একটা কোটরে। আবার তাদের দুজনেরই সবচেয়ে পছন্দের খাবার ছিল মাছ।

মাছ ছাড়াও বিড়ালের আর এক খাবার ছিল ইঁদুর। মাঝে মধ্যে বিড়ালটা মেঠো ইঁদুর ধরে খেত ঠিকই, কিন্তু মাছ পেলে সে আর অন্য কিছু চাইতো না। দীঘির মাছ আর মাঠের ইঁদুর খেয়ে তার বেশ তাগড়াই চেহারা হয়েছিল। তার কোন অভাবও ছিল না, দুঃখও না। তাই মনের সুখে সারাদিন বেশ খোশ মেজাজেই থাকতো, একা একা লাফাতো, খেলতো। তার এই খেলা দেখে গাছের ডালে বসে পানকৌড়ি গান জুড়ে দিত। কখনও যদি দুই বন্ধুর গল্প শুরু হত, তা আর থামতেই চাইতো না।

সকাল হলেই পানকৌড়ি উড়ে যেত দীঘির জলে। সাঁতার কাটতে কাটতে টুপ করে ডুব দিয়ে মাছ ধরে জলের উপর ভেসে উঠত। তারপর উড়ে আসত বট গাছের দিকে। বটের ডালে বসে কিছুটা মাছ খেয়ে মাথা-পাখনা-লেজ সমেত কাঁটাটা দিয়ে দিত বিড়ালকে। হোক পানকৌড়ির এঁটো, এমন সুখাদ্য কি বিড়াল রোজ জোটাতে পারতো? তবে এক আধ দিন যে তার ভাগ্যে গোটা মাছ জুটতো না এমন নয়। পানকৌড়ি বিড়ালের জন্য মাছ ধরে দিত। বিড়ালতো আর নিজে কখনই মাছ শিকার করতে পারতো না, বলা ভালো সে শিকার করতে জানতো না। তাছাড়া শিকারের হ্যাপা পোয়ানো তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাই পানকৌড়ির ওপরই বিড়াল ভরসা আর নির্ভর করে থাকতো। বিড়াল মাছ খেতো চুরি করে। একদিন গৃহস্থ বাড়িতে বেদম মার খাওয়ার পর চুরি করে মাছ না খাওয়ার পণ করে সে। তাই পনকৌড়ির দেওয়া মাছেই তার শখ-সাধ-স্বাদ মিটতো।

কিন্তু কথায় আছে, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়', সে কথা সত্যি করে বিড়ালের সুখও ভূতের কিলে নষ্ট হতে বসল। অনায়াসে খাবার পেয়ে বিড়াল শিকার করা মানে কি করে নিজের খাবার জোগাড় করতে হয় ভুলেই গেল। সে এত কুঁড়ে হয়ে গেল যে কোটর থেকে আর বেরই হত না। পানকৌড়ি ওপর থেকে তার জন্য মাছ ফেলতো ঠিকই, কিন্তু সব মাছ কোটরের ভেতরে ঢুকত না। কুঁড়ে বিড়াল সেগুলো খাবার জন্যও উঠত না। এভাবে কম খাওয়ায় তার শরীর রোগা আর দুর্বল হয়ে পরল, আরও অলস হয়ে গেল। অলস মস্তিষ্ক হয় শয়তানের বাসা। তার মাথায় নানা বদ-মতলব জাগতে লাগলো। অনেকদিন বিড়ালকে বাইরে না দেখতে পেয়ে পানকৌড়ি বিড়ালের খোঁজ নিতে তার কোটরে এসে ঢোকে। কদিন না খেয়ে বিড়ালের মাথায় তখন শুধু খাওয়ার চিন্তা। সে বন্ধুত্বের কথা ভুলে গিয়ে পানকৌড়ির গলা কামড়ে ধরল। এক কামড়েই ঘাড় ভেঙে পানকৌড়ি অক্কা পেল, আর বিড়াল তাকে খেয়ে তার খিদে মেটালো। তখনকার মতো খিদে মিটলো ঠিকই কিন্তু প্রতিদিনের কাবার পাবার ব্যবস্থাটা শেষ করে ফেলল। যার পরিণতি হল মৃত্যু।

● ভূতের খপ্পরে দুই ভাই ● চিরঞ্জিত দাস

নবীন ও সুধীন দুই ভাই। কলসা গ্রামের পুব দিকে তাদের বাস। বড়ভাই নবীন একটু বোকা প্রকৃতির, পড়াশোনা নিয়েই থাকে। তার একটাই শখ রেডিও তে গান শোনা। পড়াশোনা ছাড়া সে এটা নিয়েই থাকত। ছোটভাই সুধীন ঠিক তার উল্টো। বইয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। সারাদিন খেলে বেরায়।

একদিন গরমের ছুটির সকালে দুইভাই একসাথে জলখাবার খাচ্ছে, হঠাৎই সুধীন দাদাকে বলল, 'পাশের গ্রামের মেলায় আজ জব্বর জলসা আছে। শহর থেকে গাইয়ে আসছে। যাবি?' নবীন বলল, 'মা যেতে দেবে না।' সুধীন দাদাকে বলে, 'তুই বললে মা যেতে দেবে।' ভাইয়ের ফন্দি বুঝতে নবীনের দেরী হয় না। বলে, 'সেই জন্যেই আমায় বলছিস যাতে আমি মাকে বলে তোর যাবার ব্যবস্থা করে দিই। ' একগাল হেসে দাদার হাত ধরে সুধীন বলে, 'জানিস তো তুই, আমি বললে মা ছাড়বে না। আর তুইও তো গান শুনতে ভালোবাসিস।'

ভাইয়ের এঁটো হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাত ধুতে উঠে যায় নবীন। দেখে মা রান্নাঘরে। বাইরে থেকেই সে মায়ের কাছে জলসা শুনতে যাওয়ার অনুমতি চায়। মা বঁটিতে সবজি কাটছিলেন। নবীনের কথা শুনে সবজি কাটা থামিয়ে বলেন, 'নিশ্চয় ওই গাধাটা তোকে বলেছে ! কোথাও যেতে হবে না তোদের। বাবা শহর থেকে ফিরে তোদের দেখতে না পেলে খুব রাগ করবে।' নবীন এবার মাকে একটু আবদার করে বলে, 'যাই না মা। আমরা কি আর রোজ যাই? একদিনই তো যেতে চাইছি।' মা নিমরাজি হয়ে বললেন, 'রাস্তা তো ভাল না। সন্ধ্যের জলসা, শেষ হতে রাত হয়ে গেলে একা একা ফিরবি কি করে?' মায়ের এই কথায় সুধীন বুঝে যায় মাকে আর একটু সাধাসাধি করলেই পুরো রাজি হয়ে যাবে। বলে, 'একা কোথায়? আমরা কেউ একা যাব না। আমার সাথে দাদা যাবে, আর দাদার সাথে আমি।' মা ছেলের কতায় হেসে ফেলে। বলে, 'জলসা শেষ হোক আর না হোক, তাড়াতাড়ি ঘরে পিরতে হবে কিন্তু। নইলে এই শেষ। এরপর কেঁদে মরে গেলেও আমি কোথাও যেতে দেব না।'

নবীন বিকেল থেকে তৈরী হয়ে বসে থাকলেও সুধীন খেলে ফিরল সন্ধ্যের গোড়ায়। বেরোবার সময় মা একটা মুড়ি-ছোলাভাজার পুটুলি আর কয়েকটা টাকা নবীনকে দিয়ে বললেন, 'সাবধানে যাস।' মেলার মাঠ তাদের গ্রাম থেকে অনেকটা, প্রায় ঘন্টা দেড়েকের পথ। এতটা পথ তাদের হেঁটেই যেতে হবে। দু'জনে পা চালিয়ে চললেও মেলার মাঠে যখন পৌঁছাল তখন গান শুরু হয়ে গেছে। দুই ভাই গান শুনতে বসে গেল। গান শুনতে শুনতে তারা বাড়ি ফেরার কথা বেমালুম ভুলেই গেল। পাশের একটা লোককে সময় জিজ্ঞাসা করে যখন শুনলো এগারোটা বেজে গেছে তখন তাদের গান শোনা মাথায় উঠল। পরি মরি করে অনুষ্ঠান থেকে দুজনে উঠে পরল। সুধীন বলল, 'বাড়ি ফিরতে তো একটা বেজে যাবে রে দাদা!' নবীন নিরুপায় হয়ে বলে, 'সে তো লাগবেই। চল তাড়াতাড়ি হাঁটি।' সুধীন বলে, 'খালপাড় দিয়ে যাবি? তাহলে অর্ধেক সময় লাগবে। আমরাও তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাব।' নবীন কেবারে না করে

দেয়, 'ও রাস্তা মোটেই ভালো নয়। শুনিস নি ওই রাস্তায় ভূতের উপদ্রব। গেল মাসে জটি পিসির জামাই ওই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে ভূতের খপ্পরে পরে কি মারটাই না খেয়েছিল।' সুধীন বলে, 'মার তো আমাদের কপালে নাচছে। মা কি এমনি ছেড়ে দেবে। চ্যালা কাঠ পিঠে ভাঙবে। না হয় ভূতের মার খেলুম, কিন্তু বাড়ি তো তাড়াতাড়ি যাওয়া হবে।' নবীন এই কথা বলে দাদাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে গেল খালপাড়ের রাস্তায়। বেশ কিছুটা চলার পর ওদের মনে হ'ল পিছনে কেউ যেন আসছে। কিন্তু পিছন ঘুরে কাউকে দেখতে পেল না। আবার কিছুটা যাওয়ার পর পিছন থেকে ফিস ফিস শব্দ শুনতে পেল। নবীন ভয়ে ভায়ের হাতটা চেপে ধরল, সুধীন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কে ওখানে?' কোনো সাড়া মিলল না। দুই ভাই এগোতে থাকল, কিন্তু মন পরে পিছন দিকে। হঠাৎ দুজনেরই মনে হ'ল পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে। পিছন ঘুরতেই দেখে রোগা-লম্বা-কালো কুচকুচে চেহারার দুজন দাঁড়িয়ে। নবীন ভয়ে কুঁকড়ে গেল, সুধীন বলে উঠল, 'কে রে?' লোক দুটো হা-হা-হা-হা করে ভয়ঙ্কর হাসি হেসে দুই ভাইয়ের মুখ টিপে ধরে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলল। দুই ভাইই জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরতে তারা দেখল একটা উঁচু গাছের মাথায় তক্তার ওপর শুয়ে। তাদের চারপাশে আরো সব কালো কালো রোগা রোগা লোক। উঠে বসে বুঝলো তারা কেউ মানুষ নয়, সব ভূত। চারপাশ থেকে আরো ভূত আসছে উড়ে উড়ে। যেন তারা গাইয়ে আর তাদের গান শুনতে শ্রোতারা জড়ো হয়েছে।

ব্যাপারটা যে আসলে তাই তা বুঝল যখন তাদের কানে এল মাইকের শব্দ। নাকি সুরে কেউ বলছে, 'এঁবাঁরে দুঁটো মাঁনুষেঁর বাঁচ্চাঁ গাঁন গাঁইবেঁ। গাঁন শেঁষ হঁলেঁ এঁদেঁর ঘাঁড় মঁটকেঁ খাঁবঁ।' ঘোষণা শুনে কচি-বুড়ো-ছেলে-মেয়ে-রোগা-মোটা-গলা কাটা সবরকম ভূতের দল তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল। ব্যাপার দেখে নবীনের হাড় হিম হয়ে গেল, সুধীন ভয়ে দাদার হাত চেপে ধরল। একটা ধুতিপরা লম্বা ভূত এসে হাতজোড় করে তাদের গান শুরু করতে বলল। সুধীন বলল, 'বাজনা ছাড়া কী করে গান হবে। আমরা চট করে গ্রাম থেকে বাজিয়েদের নিয়ে আসি।' ধুতিপরা লম্বা ভূতটা বলল, 'আমাদেরকে অত বোকা ভেবোনা। গ্রামে গেলে যে তোমরা আর ফিরবে না তা ভালো করেই জানি। এই, বোষ্টমি ভূতের কাছ থেকে খঞ্জনিটা নিয়ে আয় তো।' সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জনি এসে গেল। নবীন অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠছিল। সুধীন দাদাক বলল, 'তুই খঞ্জনিটা বাজিয়ে যা। একদম থামবি না। আমি গান ধরছি।' ধুতিপরা ভূতটা নবীনের হাতে খঞ্জনিটা দিয়ে যেই বলেছে গান শুরু, অমনি ভূতেদের মুখ থেকে নাল-ঝোল পরতে লাগল । গান শেষ হলেই যে তাদের খাবে। নবীন খঞ্জনি বাজানো শুরু করল আর সুধীন গলা ছেড়ে চিৎকার করতে লাগল, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।' গান শুনে তো ভূতেদের মধ্যে হুরোহুরি বেধে গেল। সবাই খুঁজছে সেই ভূতদুটোকে যারা এই দুইভাইকে ধরে এনেছে। পালাতে গিয়ে ধরা পরে সবার হাতে মার খেয়ে এমন অবস্থা হল যে নেহাত তারা মরে ভূত হয়েছে না হলে আজই ভূত হয়ে যেত। গান কিন্তু থামেনি একবারের জন্য, খঞ্জনিও একটানা বেজে চলেছে। ভূতেরা এটা আশা করেনি, তাই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নামসংকীর্তণের ধাক্কা তারা সহ্য করতে পারল না। তাদের মাথা গুলিয়ে উঠল, গোটা গা টনটন করে উঠল। মাইকে ঘন ঘন ঘোষণা হতে লাগল, 'ওঁরেঁ তোঁরাঁ কাঁনেঁ আঁঙুল দিঁয়েঁ যেঁ যেঁখাঁনেঁ পাঁরিঁস পাঁলাঁ'। পরিমরি করে ভূতেদের পালাতে দেখে দুই ভাইও আর সময় নষ্ট করল না। খঞ্জনি বাজিয়ে হরিনাম করতে করতে গাছ বেয়ে নীচে নেমে সটান দৌড়। এক নিশ্বাসে ছুটতে ছুটতে দুই ভাই বাড়ির কাছে আসতেই দেখতে পেল মা লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে। ভূতের খপ্পর থেকে বেঁচে ফিরলেও মায়ের হাত থেকে নিস্তার নেই তাদের। মা লণ্ঠন রেখে দুই জনের দুই কান ধরে ঘরে নিয়ে গেল।

অ লৌ কি ক

দেবার্ঘ্য রায় (পঞ্চম শ্রেণী)

স্কুল থেকে ফিরে বাড়ি ফিরছি, দেখি বাড়ির সামনে একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আর লোকজনের ভিড়। কে এসেছে ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকতেই বিতানদার গলা পেলাম, 'কি বোকচন্দর! গান কেমন চালাচ্ছ?' বলে হাতে করে বন্দুক দেখায়। বিতানদা আমার জেঠুর ছেলে, সদ্য একটি গানের প্রতিযোগিতা জিতেছে। মুম্বই চলে যাবে তাই দেখা করতে এসেছে। আমার দারুন মজা, কারণ আমার যে কোনো সমস্যা বিতানদা ঠিক করে দেয়। আর এখন আমার সমস্যা হ'ল ছোটদের পাতার জন্য লেখা তৈরী করা। শুধু কাটাকুটি চলছে লেখা বের হচ্ছে না। জলখাবারের পর বিতানদাকে বলল, 'নো প্রবলেম। তোকে আমার একটা ঘটনা বলছি, দেখ সেটা থেকেই তোর লেখার বিষয় পেয়ে যাবি।' বিতানদা সেদিন যা আমায় বলেছিল আমি হুবহু লিখে দিলাম।

''বছর পাঁচ-সাত আগের ঘটনা। হাওড়ার পানপুরে গানের তালিম নিতে যেতাম। যাওয়ার পথে একটা জায়গা দেখতাম খুব সুন্দর। নদী, রেললাইন, গাছপালা — একেবারে ছবির মতো। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের বলতেই সবাই বলল একদিন পিকনিক করতে যাবে। আমরা একটা রবিবার বেরিয়ে পরলাম। একটা মনের মতো জায়গা দেখতে পেয়ে বাস থামিয়ে নেমে পরলাম। রাস্তার পাশ দিয়েই রেললাইন গেছে। সেটা পেরিয়ে নদীর দিকে গেলাম। নদীর পাড়ে একটা চাতাল করা ছিল। আমরা সেখানে বসলাম। সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর জলে। নদীতে খুব স্নান করলাম। সবাই সঙ্গে করে খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই ভাগ করে সবাই মিলে খেলাম। অচেনা জায়গা বলে আমরা বেলা থাকতে থাকতে আবার বাস রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর বাস এল। আমাদের তুলে নিয়ে বাস চলতে লাগলো। আমার একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। হঠাৎ ঝাঁকনি দিয়ে বাস থেমে গেল। শুনলাম ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে। ড্রাইভার কণ্ডাক্টার সারাবার চেষ্টা করেও পারল না। বাসের লোকজন সব বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু করেছে। আলোও বেশ কমে এসেছে। অচেনা জায়গা। তাই না দাঁড়িয়ে আমরাও হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুটা হাঁটার পর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল। বাস যাত্রীদের কাউকে আর রাস্তায় দেখতে পেলাম না। আমরা ক'জনে শুধু হাঁটছি। খুব অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের এক বন্ধু তার বাবার মোবাইলটা নিয়ে এসেছিল। সেটা থেকেই তার বাড়িতে খবর দেবার চেষ্টা করা হল কিন্তু ফোন পাওয়া গেল না। বারবার ফোনের চেষ্টা করায় এক সময় ব্যাটারি ফুরিয়ে গিয়ে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল। যোগাযোগের যেটুকু আশা ছিল তাও গেল। আমরা হেঁটেই চলেছি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই একজন বয়স্ক মানুষ বেরিয়ে এলেন। আমরা রাতটুকু থাকার জন্য বলতেই দোতলায় যেতে বললেন। আরো বললেন তিনি এখানে থাকেন না, রাতে বাড়ি চলে যান আর আমরা যেন রাতে ঘরের বাইরে না বের হই। আমরা ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে তক্তপোশে শুয়ে পরলাম। এতটা হেঁটে সবাই ক্লান্ত। বাড়িতে যে কি হচ্ছে

সেটা ভেবেই সবার মুখ শুকিয়ে গেল। সবাই যে কখন ঘুমিয়ে পরেছি বুঝতেই পারিনি। সুনীলের ডাকে ঘুম ভাঙল। সুনীলের খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। বাড়িতে ঢোকার সময় বাইরে একটা টিউবওয়েল দেখেছিলাম। দরজা খুলে সেখানেই গেলাম। সুনীল কলে মুখ লাগিয়ে, আমি বার দুই টিপতেই জল উঠে এল। এ কি! টর্চের আলোয় দেখলাম জল নয়, গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। সুনীলকে জল খেতে নিষেধ করতে করতে দু'এক ঘোঁট খেয়ে ফেলল। লোকটি বাইরে বের হতে মানা করেছিলেন, আমরা শুনিনি। সুনীল হঠাৎ পাগলের মতো াচরণ করতে লাগল। ছুটে এসে আমার গলা টিপে ধরল। আমি ছাড়াতে না পেরে বন্ধুদের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। আমি চিৎকার করতেই আরো জোরে গলা টিপে ধরল। বন্ধুরা নেমে এসে ওকে ছাড়াতেই অজ্ঞান হয়ে পরে গেল। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিনা, এমন সময় দেখি এক ভদ্রমহিলা আমাদের পাশে বালতি হাতে দাঁড়িয়ে। বললেন, 'এতরাতে তোমরা কারা গো! কোত্থেকে এয়েচ?' সংক্ষেপে তাঁকে সব বলতে তিনি বললেন আমরা কি দেখতে কি দেখেছি তাই ভয় পাচ্ছি। পাশেই গ্রামিন হাসপাতাল, সেখানেই সুনীলকে নিয়ে যেতে বললেন। তিনিও চললেন আমাদের আগে অগে, পথ দেখিয়ে। হাসপাতাল বলে আমাদের যেখানে নিয়ে এলেন সেটা একটা পোড়ো বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে ঢোকার সময় ভদ্রমহিলাকে আর দেখতে পেলাম না। ডাক্তারবাবুকে ডাকাডাকি করতে একজন লোক এল। বলল সে কম্পাউণ্ডার। ডাক্তারবাবু গ্রামে রুগী দেখতে গেছে। অগত্যা কম্পাউণ্ডারের হাতেই সুনীলকে ছেড়ে দিতে হ'ল। তার কথা মতো সুনীলকে একটা বেডে শুইয়ে দিলাম। কম্পাউণ্ডার সুনীলের পাশে বসে মাথায় হাত বোলাতে লাগল আর 'কি কষ্ট গো' বলে নাকে কাঁদতে শুরু করলো। আমরা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ সুনীলের চিৎকার শুনে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখি সুনীল বেডের ওপর দাঁড়িয়ে আর মাটিতে একটা কঙ্কাল পরে। আমাদের দেখে সুনীল লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়েই ছুটতে লাগল। আমরাও ছুট দিলাম ওর পিছন পিছন। কতক্ষণ ছুটেছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখলাম রেল লাইন। রেললাইন ধরে কিছুটা ছুটতেই স্টেশন দেখতে পেলাম। টিকিট ঘরে বাতি জ্বলছে দেখে আমরা হাওড়ার ট্রেন কখন আসবে জানতে গেলাম। লোকটি বলল ট্রেন সেই সকালে, রাতে কোনো ট্রেন নেই। আমরা ফিরে আসছি তখনই মুখ বাড়িয়ে লোকটি বলল , 'পাশেই আমার কোয়ার্টার। রাতটা ওখানেই ঘুমিয়ে নাও গে। আমার বৌ আর মা আছে। তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।' আমরা তাঁর কথা মতো কোয়ার্টারের দরজায় টোকা দিতেই এক ঘোমটা দেওয়া ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, 'রেলবাবু পাঠালেন বুঝি তোমাদের।' আমরা ঘাড় নাড়তেই ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এ গ্রামটা এত চুপচাপ কেন। যেন মনে হচ্ছে কোনো জনপ্রাণী নেই। উনি বললেন, 'নেই তো! সব মরে ভূত হয়ে গেছে।' তাহলে আপনারা একা একা এখানে রয়েছেন কি করে বলতেই উনি উত্তর দিলেন, 'একা কই, সবাইতো একসাথেই আছি।' কথাটা কেমন খোঁনা খোঁনা শোনাচ্ছে। বললাম এখানে তো সবাই মরে গেছে বললেন, তাহলে — আমার মুখের কথাটা শেষ হওয়ার আগে বললেন, 'আঁমিঁওঁ বেঁচেঁ নেঁই।' মুখ ঘোরতেই দেখি ঘোমটাটা খুলে গিয়ে কঙ্কালের মুখ। একানে কে মুহূর্ত আর নয় বলে চোখ কান বুজে যে যেদিকে পারলাম ছুট দিলাম। তারপর আর মনে নেই। একটা শব্দে যখন চোখ খুললাম দেখি একটা স্টেশনের প্লাটফর্মে একটা গাছের নিচে শুয়ে। উঠে বসে দেখি পাশে শুয়ে আমার বন্ধুরা। একটা জোরলো আলো এগিয়ে আসছে। একটু ধাতস্থ হতে বুঝলাম ট্রেন আসছে। সবাইকে ডেকে তুলে ট্রেনে উঠে পরলাম। এবার যেন ধরে প্রাণ এল। ট্রেনের লোকেদের সাথে কথা বলে জানলাম ওই গ্রামটাকে সবাই ভূতের গাঁ বলেই জানে। একবার মারাত্মক কলেরায় প্রায় সবাই মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তারাও গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। রাত একটার সময় হাওড়া পৌঁছালাম, তারপর বাড়ি। বাড়ি পিরে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলে সে যাত্রায় পিঠ বাঁচালেও স্মৃতিটা কিন্তু ভুলতে পারিনি।" ✿

জ ং লী

ছোটবেলায় সবার মনেই অনেকরকম ইচ্ছা জাগে। অনেক কিছু করার, অনেক কিছু হওয়ার। কিন্তু এমন একজন মানুষ আছেন যাঁর খুব ছোটবেলায় একটা জঙ্গল বানানোর ইচ্ছা হয়েছিল। সব ছোটরই তো ইচ্ছা জাগে কিন্তু সেটা বাস্তবে হয়ে ওঠে না। তবে এই ইচ্ছেটা পূরণ হ'ল। তোমরা ভাবছ খুব সহজ বোধহয়, এমনিই সব হয়ে গেল, তা কিন্তু নয়। একদিন দু'দিন নয়, পুরো তিরিশটা বছর লেগে গেছে তার স্বপ্নপূরণ করতে। তবে তার স্বপ্ন এখনও পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি। শুধু জঙ্গল হলেই তো হবে না, তাকে রক্ষা করতে হবে। আর এইটাই তো আসল কাজ। তোমাদের নিশ্চয়ই খুব জানতে ইচ্ছা করছে কে সেই লোক, কী করে সে এমন কাজ করলো। তাহলে শোনো এক জংলী মানুষের কথা।

যাঁর কথা তোমাদের বলছি তাঁর নাম **যাদব পায়েং**। তাঁকে অবশ্য **'মলাই'** নামে সবাই চেনে। তাই তাঁর বানানো জঙ্গলকে লোকে **'মলাই কাথোনি'** মানে **মলাইয়ের জঙ্গল** বলে। অসমের জোরহাট জেলার বাসিন্দা যাদব পায়েং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে 'বালি ভিতি' মানে বালি ভরা জমিতে গাছ লাগিয়ে এই জঙ্গল বানিয়েছেন। পায়েং যখন প্রথম গাছটি লাগান তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর। সেই ১৯৭৯ সাল থেকে আজ ২০১৪। এক নাগাড়ে গাছ লাগিয়ে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তিনি যে জঙ্গল বানিয়েছেন তার জমির পরিমাণ ১৩৬০ একরের (৫৫০ হেক্টর বা ৫.৫ বর্গ কিলোমিটার) বেশী।

পায়েং যখন ছোট তখন ব্রহ্মপুত্রের চরে কোনো গাছপালা ছিল না। একদিন সূর্যের প্রচণ্ড তাপে একটি সাপকে মরে পরে থাকতে দেখেন পায়েং। পশুপ্রেমী পায়েং সাপটিকে দেখে কেঁদে ফেলেন। তিনি বন দপ্তরের কাছে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের চরে গাছ লাগাতে অনুরোধ করেন। বন দপ্তর জানায় ঐ অঞ্চলে গাছ লাগানো যাবে না, কারণ ওখানকার মাটিতে গাছ হয় না। পায়েংকে তারা ওখানে বাঁশ গাছ লাগাবার পরামর্শ দেয়। সেই থেকে পায়েং গাছ লাগিয়েই চলেন। ধীরে ধীরে গাছপালাহীন প্রান্তর সবুজ হয়ে উঠতে থাকে। সবুজ জঙ্গল হয়ে ওঠে পাখি, হরিণ, গণ্ডার, বাঘ এবং হাতির বাসস্থান। পায়েং-এর জঙ্গলে পাঁচটা বাঘ আছে। তাদের আবার দু'টো বাচ্ছা হয়েছে। পৃথিবীতে যখন বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমেই চলেছে তখন পরিবেশ প্রেমীদের কাছে এটা খুব আনন্দের খবর। পায়েং তাঁর নিজের জঙ্গলেই একটা ছোট ঘর বানিয়ে স্ত্রী বিনিতা আর তিন ছেলেকে নিয়ে বাস করেন। পায়েং এবং তাঁর জঙ্গল নিয়ে উইলিয়াম ডগলাস ম্যাকমাস্টার্স একটি তথ্যচিত্র বানান সেটি ২০১৪ কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা তথ্যচিত্রের সম্মান পেয়েছে।